৪৫.১ প্রস্তাবনা

বৈচিত্র্যময় দেশ ভারত। রাজনৈতিক চেতনা ও চিন্তাশীলতার উন্মেষও এখানে বহুমুখী; সেই প্রাচীনকাল থেকে রাজনৈতিক চিন্তার বিভিন্ন পথে পরিক্রমা করেছেন অনেকেই। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথের মতো এমন বিচিত্র ও ঘটনাবহুল জীবন ভারতীয় রাজনীতিতে বিরল। মানবেন্দ্রনাথের জীবন ও মনন ধারাকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় — (১) ছাত্র বয়সে দেশের জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ, (২) যৌবনে মার্ক্সবাদী আদর্শে দীক্ষা এবং (৩) পরিণত বয়সে পূর্ণ মানবতার আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করা। এগুলি কোনও বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়, বরং পরস্পরসম্পৃক্ত। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তি, অগাধ পান্ডিত্য আর অজস্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি বার বার খুঁজে নিতে চেয়েছেন জীবনের মূল সুরটিকে ।

৪৫.২ প্রাথমিক পর্যায়

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ১৮৮৭ সালের ২১শে মার্চ ২৪ পরগণা জেলার আরবেলিয়া গ্রামে সংস্কৃত পন্ডিত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্যের রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্রনাথ ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়। গোঁড়া ধর্মীয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেও ছেলেবেলা থেকেই রাজনীতি সম্পর্কে এক স্বচ্ছ ধারণা ছিল নরেন্দ্রনাথের। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী ব্রিটিশ রাজশক্তিকে এদেশে থেকে উৎখাত না করলে দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না তা' তিনি প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেন। বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করে। সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন চন্দ্রের ওজস্বিনী ভাষণ, তিনি স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন। কিন্তু মডারেটদের আবেদন-নিবেদন নীতির পরিবর্তে আকৃষ্ট হন 'লাল-বাল-পালের' চরমপন্থী রাজনীতির ধারায়। শেষে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের আহবানে সাড়া দিয়ে বিপ্লবী গোষ্ঠী অনুশীলণী সমিতি, যুগান্তর দলের হয়ে গুপ্ত সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন, নরেন্দ্রনাথ। ১৯১০ সালে হাওড়া, ষড়যন্ত্র মামলা ও ১৯১৫ সালে কলকাতায় রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে কুড়িমাস কারারুদ্ধ থাকেন। শোনা যায়, এই সময় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে তাঁর মনে এক নতুন ভাবের উদয় হয়। মুক্তির পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন ও পদব্রজে দেশ ভ্রমণ করেন। কিন্তু প্রকৃত শান্তি তিনি পাননি।

এরপর যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মকান্ডে জার্মানদের সাহায্যে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির (বাটাভিয়া থেকে সুন্দরবনে) চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে তিনি দূরপ্রাচ্যে পাড়ি দেন। চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি বহু জায়গা ছদ্মবেশে ঘুরে অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন। তবে তাঁর সংযোগ ঘটে রাসবিহারী বসু, সান ইয়াৎ সেনের মত বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। এরপর নরেন্দ্রনাথ গোপনে পাড়ি দেন সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এখানেই তিনি নতুন নাম নেন মানবেন্দ্র নাথ রায়। নিউ ইয়র্কে এসেই তাঁর সাক্ষাৎ হয় জাতীয়তাবাদী নেতা লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে। এখানেই প্রথম অনেক প্রগতিশীল

সমাজবাদীর সংস্পর্শে এসে সমাজবাদী ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু এখানে সরকারও তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। শেষে মেক্সিকোয় এসে আশ্রয় নেন।

মেক্সিকোতে তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়। এখানেই তাঁর পরিচয় হয় রুশ বিপ্লবী নেতা মিখাইল বোরোদিনের সঙ্গে, যাঁর তত্ত্বাবধানে মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদ তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষিত হন; উত্তরণ ঘটে জাতীয়তাবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে। মার্ক্সের বস্তুবাদী ভাবনার প্রভাবে এসে তিনি উপলব্ধি করেন বিপ্লব কোনও সাধারণ আন্দোলন মাত্র নয়। শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন জাতীয়তাবাদীর নেতৃত্বে ইংরেজ বিতাড়নের মধ্যে দিয়ে বিপ্লব সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। বিপ্লবে যুক্ত করতে হবে আপামর জনগণকে, আনতে হবে আমূল পরিবর্তন আর্থ সামাজিক কাঠামোয়। তাই প্রয়োজন আছে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার। বিপ্লব আসবে ধাপে ধাপে - প্রথমে সমাজবাদ ও তারপর সাম্যবাদ। তিনি আরও বুঝলেন বিপ্লব কোনও দেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়; চাই বিশ্বব্যাপী সামাজিক বিপ্লব।

১৯১৯ সালে রাশিয়ার বাইরে মেক্সিকোতে পৃথিবীর প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন মানবেন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশান্যালের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হন।

৪৫.৩ কমিন্টার্ন ও মানবেন্দ্রনাথ

১৯২০ সালের জুলাই মাসে পেট্রোগ্রাদে বসে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস। মানবেন্দ্রনাথ মেক্সিকোর প্রতিনিধি হিসাবে তাতে যোগদান করেন। এর আগে কিছুদিন বার্লিনে কাটাবার সুবাদে তিনি একদিকে যেমন বেশ কিছু ভারতীয় বিপ্লবীদের সাথে পরিচিত হন, তেমনি অন্যদিকে বার্ণষ্টাইন, কাউটস্কি, সেয়ার, থালহাইমার, রোজা লুক্সেমবার্গ প্রমুখ বহু প্রবীন ও নবীন কমিউনিস্টদের সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁদের দ্বারাও প্রভাবিত হন। এই সময়ে লিখিত 'An Indian Communist Manifisto' (1920) গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর মার্ক্সবাদী ভাবনা-চিন্তা তুলে ধরেন। তিনি দেখান যে, সামাজিক বিপ্লব ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। তাই সাধারণ মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি এই গ্রন্থে ধারালো যুক্তি পেশ করেন।

৪৫.৩.১ লেনিন - রায় মতবিরোধ

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসেই মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে লেনিনের ইতিহাস বিখ্যাত বিতর্ক ঘটে। ঔপনিবেশিক অনুন্নত দেশগুলিতে কমিন্টার্নের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন পেশ করেন তাঁর প্রখ্যাত 'Thesis on the National and Colonial Question' । লেনিনের বক্তব্য ছিল, পৃথিবীর বুকে যতদিন সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্য করবে ততদিন দেশের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে পশ্চিমী উন্নত দেশগুলির সর্বহারা আন্দোলনের মৈত্রীর সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। "The Communist International must be ready to establish temporary relationship and

even alliances with bourgeois democracy of the colonies and backward classes." লেনিনের এই বক্তব্য মানবেন্দ্রনাথ পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণী কোনও বৈপ্লবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেনা। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি দেখান যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রণক্লান্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উপনিবেশগুলিতে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সেখানকার উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীকে কিছু কিছু সুবিধা দিয়ে তাদের আনুকুল্য অর্জন করছে। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলত, এই অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ একটি পাল্টা থিসিস উপস্থাপিত করেন। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য ছিল জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টদের কাজ হবে যুগপৎ গণবিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল ও সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত এক সমাজ গঠনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। তাঁর ভাষায় — "Two distinct movements which grow farther apart each day are to be found in the dependent countries. One is the bourgeois democratic nationalist movement with a programme of political independence under the bourgeories order. The other is the mass struggle of the poor and ignorant peasants and workers for their liberation from all forms of explaitation. তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি আরও অনুধাবন করলেন যে, এশিয়ায় ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন ছাড়াই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এশিয়ায় বৈপ্লবিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, এশিয়ায় বিপ্লব জয়যুক্ত না হ'লে ইউরোপেও তার বিজয়লাভ সম্ভব নয়; কারণ পরাধীন দেশগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে যাবে। তবে এই সমস্ত অঞ্চলে সমাজবাদী আন্দোলনের প্রকৃতি হবে স্বতন্ত্র, কারণ এখানকার বাস্তব পরিস্থিতি ও শক্তি-সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন। রাশিয়া বা ইউরোপের কলাকৌশলগত প্রযুক্তি এখানে প্রযোজ্য নয়। এখান থেকেই যাবতীয় বিরোধের উৎস।

লেনিন অবশ্য রায়ের "non capitalist path of development"-এর তত্ত্ব মেনে নিলেও মানবেন্দ্রনাথের পুরো বক্তব্যের সাথে একমত হ'তে পারেননি। তবে ঔপনিবেশিক দেশ সম্পর্কে রায়ের অভিজ্ঞতা ও অখন্ডনীয় যুক্তির প্রশংসা না করে পারেননি। ফলে ঐ অধিবেশনে লেনিনের থিসিসের কিছু অংশ সংশোধিত হয় এবং অল্পবিস্তর সংশোধনের পর রায়ের থিসিসও 'Supplimentary Thesis হিসাবে গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে এই বিতর্কের ফল হয় সুদূরপ্রসারী যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় রুশ-চীন বিরোধে।

স্বাধীনচেতা মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কমিন্টার্নের দূরত্ব ক্রমাগত বাড়তে থাকে, কারণ তাঁর মনে হয়, কমিন্টার্ন বিশ্ববিপ্লবের পরিকল্পনা থেকে সরে এসে মূলত সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির লক্ষ্য পূরণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। চীন-বিপ্লব প্রশ্নে এই বিরোধ আরও বাড়ে। কমিন্টার্নের প্রতিনিধি হিসাবে মাইকেল বোরোদিন এই সময় চীনে ছিলেন। কম্যুনিস্ট ও কুয়োমিনটাং -এর মধ্যে ঐক্যের প্রশ্নে কমিন্টার্নের নীতিকে

কার্যকর করার উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে একটি দল চীনে যায়। মানবেন্দ্রনাথ চাইলেন কৃষি বিপ্লবের পথে চীন অগ্রসর হোক। অন্যদিকে বোরোদিন চাইলেন কমিউনিস্টরা কুয়োমিনটাং-এর বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে একযোগে উত্তর চীনে পিকিং অভিযান শুরু করুক। মানবেন্দ্রনাথের অভিমত গৃহীত হ'লেও চীন বিপ্লবে সাফল্য আসেনি। কৃষি বিদ্রোহে চীনের কমিউনিস্টরা নিষ্ক্রিয় থাকে। বিপ্লব বিরোধিতার জন্য অভিযুক্ত হয় কমিউনিস্টরা। চীনে বিপ্লবের ব্যর্থতায় রায়ের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে কমিন্টার্নের। বামপন্থী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের প্রশ্নেও লেনিনের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হ'তে পারেননি রায়। এরপর ১৯২৭ সালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়ার যে প্রস্তাব মানবেন্দ্রনাথ দেন তাও কমিন্টার্নের অনুমোদন পেল না। এরপর শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথ উগ্র পন্থা ছেড়ে মধ্য শ্রেণীর সহযোগিতার উদার আহ্বান জানান। এইভাবেই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়তেই থাকে। শেষ পর্য্যন্ত ১৯২৮ সালে মস্কোয় কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে চীনের বিষয় নিয়ে মানবেন্দ্রনাথের 'decolonization theory' র তীব্র সমালোচনা করা হয়। কমিন্টার্নও তখন পূর্ব অনুসৃত নীতি থেকে সরে গিয়ে উগ্র বামপন্থী নীতি গ্রহণ করে। মানবেন্দ্রনাথ কমিন্টার্নে গৃহীত নীতিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেনও শেষ পর্য্যন্ত বহিষ্কৃত হ'ল। বস্তুত এখানেই তাঁর কমিন্টার্ন জীবনের পরিসমাপ্তি।

৪৫.৪ মানবেন্দ্রনাথ ও ভারতীয় রাজনীতি

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে মেক্সিকোর প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করলেও ভারতের জাতীয় সংগ্রামের প্রকৃতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি যে কি মাত্রায় সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ মেলে ১৯২২ সালে প্রকাশিত রায়ের লেখা 'India in Transition' গ্রন্থটিতে। শোনা যায়, এটি লেনিনের আগ্রহে ও পরামর্শেই লিখিত। এই বইটি প্রথম ভারতীয় বিপ্লবের মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ। বইটিতে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির মনোগতি সম্পর্কে এক সুন্দর তথ্য সমৃদ্ধ চিত্র তুলে ধরেন রায়। তিনি দেখান যে, ভারতীয় জনগণ একই সাথে বিদেশী প্রভু ও জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল শোষণের শিকার এবং যুদ্ধের পর আপাত সংস্কারের মাধ্যমে বুর্জোয়া শক্তির সঙ্গে আপোস করে নিজেদের দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগঠনের উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি না থাকায় প্রবাসে বসেই তাঁকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা করতে হ'ল। কয়েকজন শিক্ষিত উৎসাহী মুজাহির যুবককে সঙ্গে নিয়ে ১৯২০ সালে ১৭ই অক্টোবর তাসখন্দে থাকাকালীন ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯২২ সালে এর সদর দপ্তর বার্লিনে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখান থেকে 'The Vanguard of Independence' নামে এক পত্রিকা সম্পাদন করেন। রায়ের প্রচেষ্টায় বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন শহরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে।

মনেপ্রাণে পুরোপুরি মার্ক্সবাদী মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীজীর মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও রক্ষণশীল নেতৃত্বের

সমালোচনা করেন। ১৯২১ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা করেন। ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের আগে মস্কো থেকে সংগ্রামী আন্দোলনের এক কর্মসূচী পেশ করেন তাতে পূর্ণ স্বাধীনতা, ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, জমিদারী প্রথা বিলোপ, জাতীয়করণ, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি কর্মসূচীর ডাক দেন।

১৯২৯ সালে লাহোরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ করলে মানবেন্দ্রনাথ তাকে অভিনন্দিত করেন এবং সেই সঙ্গে এক বার্তায় বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান অভিযুক্ত। কিন্তু সেই সময় তিনি বিদেশে থাকায় তাঁকে ধরা যায় নি। ১৯৩০ সালে তিনি গোপনে ভারতে চলে আসেন ও বিভিন্ন ছদ্মনামে ভারতের সর্বত্র ঘুরে নেহেরু, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে তিনি শ্রমিক, কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। Action for Independence of India নামে একটি বৈপ্লবিক দল গঠিত হয়। ১৯৩১ সালের ২১শে জুলাই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার জন্য মানবেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন ও ছয় বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গান্ধীজীর সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কারামুক্তির পর মানবেন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসেই এক দৃঢ়চেতা সৈনিক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনে রায়পন্থীদের ছিল বিশিষ্ট ভূমিকা। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের লক্ষ্যে বামপন্থী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেসকে এক বৈপ্লবিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতির বিপ্লবের সাথে সাথে দরকার সাংস্কৃতিক বিপ্লব; কারণ দেশের মানুষ যতদিন যুক্তিবিমুখ, ধর্মান্ধ এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকবে ততদিন দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণ সম্ভব নয়। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের মধ্যেই র‍্যাডিকেল কংগ্রেস নামে একটি উপদলও গঠন করেছিলেন; সেটা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব মোটেই সুনজরে দেখেন নি। আবার কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরাও রায়ের বিপ্লবী কর্মপন্থার চেয়ে গান্ধীর নৈতিকপন্থায় বেশি আস্থাশীল ছিলেন কমিউনিস্টদের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে রায় ক্রমাগত একা হয়ে পড়েন। শেষ পর্য্যন্ত নিজের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে ১৯৪০ সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে নিজস্ব দল গড়ে তুললেন।

মার্ক্সবাদী হয়েও মার্ক্সীয় চিন্তাকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে মানবেন্দ্রনাথ নিজের মত ও পথে পরিচালিত হয়েছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের গতিপথ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মনে করেছিলেন ভারতীয় বিপ্লব প্রথমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং পরে প্রলেতারিয়েত বিপ্লব না হয়ে দুইয়েরই সংমিশ্রণে সোস্যালিস্ট বিপ্লব হওয়াই সুবিধাজনক ও বাঞ্ছনীয়।

কোনও বিশেষ দেশ বা জাতিকে সমর্থন বা বিরোধিতা করে নয়, বিশ্বকে সর্বনাশা ফ্যাসিবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমস্ত ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার

লিপ্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদও তার শক্তি হারাবে এবং তখন পরাধীন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা অনিবার্যভাবেই আসবে। এই ব্যাপারে কমিউনিস্টরা একমত হ'লেও তিনি ভারতীয়দের সমর্থন বিশেষ পেলেন না। জনপ্রিয়তাও হারালেন।

'৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনকেও মানবেন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে বাধা দেবার প্রয়াস হিসাবে নিন্দা করেন। এমনকি কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে ফ্যাসিবাদী বলতেও কুণ্ঠিত হন নি। তিনি কংগ্রেসের সুযোগ সন্ধানী, স্বার্থপর, বুর্জোয়া চরিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তিনি জানান, নিরক্ষর, মূঢ়, ধর্মান্ধ দেশবাসীর আবেগ ও উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী শুধু নিজেদের স্বার্থসাধনে তৎপর।

যুদ্ধ যখন মিত্রশক্তির অনুকূল হ'তে শুরু করে তখন স্বাধীনতা আসন্ন জেনে রায় স্বাধীন ভারতের আর্থিক কাঠামোর রূপরেখা কি রকম হবে তাই নিয়ে Peoples Plan নামে (১৯৪৪) এক পরিকল্পনা রচনা করেন। সেখানে গুরুত্ব পায় কৃষি উন্নয়ন, সমাজ সেবা আর আর্থিক স্বনির্ভরতা। এর একবছরের মধ্যেই উপস্থিত করেন স্বাধীন ভারতের জন্য এক সাংবিধানিক খসড়া বা Draft Constitution যেখানে স্বীকৃতি পেল মানুষের মৌলিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিসত্তার বিকাশ।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মানবেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্র বা সর্বহারার একনায়কত্ব কোনটিই মানুষকে নিরঙ্কুশ মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে না। মার্ক্সবাদের বিরোধিতায় মার্ক্সীয় দর্শনকে অতিক্রম করে নিয়ে এলেন এক নতুন দর্শন, যার নাম র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজম্ বা নব মানবতাবাদ, যার মূল মন্ত্র হ'ল যুক্তি, নৈতিকতা ও মুক্তি। রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন না দিয়ে তিনি ফিরিয়ে আনলেন মানবতাবাদী দৃষ্টিকে। রাষ্ট্রের বিলুপ্তিতে নয়, আস্থা প্রকাশ করলেন মানুষের কল্যাণকামী রাষ্ট্রে। তাঁর নতুন রাষ্ট্র প্রভুত্ববাদী বা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র হবে না — থাকবে না সেখানে কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণী বা পার্টির আধিপত্য। এই নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমবায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো।

এই নবলব্ধ মানবতাবদের ভাবনাকে সামনে রেখে ১৯৪৬ সালে মানবেন্দ্রনাথ রচনা করেন Twenty Two Thesis বা বাইশ দলিল যার মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেন পার্টি প্রথার মাধ্যমে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, কারণ তাতে পার্টির আধিপত্য ও ক্ষমতা দখলই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, সমাজ ও সাধারণ মানুষের অকল্যাণ হয়; বিঘ্ন হয় মানবতাবাদী দর্শন ও রাজনীতির। তাই ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ নিজেই ভেঙ্গে দেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এরপর তিনি তাঁর দলহীন রাজনীতির আদর্শ দেশ ও বিদেশে প্রচারের চেষ্টা চালিয়ে যান। অবশেষে ১৯৫৪ সালে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মানবেন্দ্রনাথের জীবনাবসান হয়।

৪৫.৫ মার্ক্সবাদ ও মানবেন্দ্রনাথ

ভারতের জাতীয় রাজনীতির উপর মার্ক্সীয় বিশ্লেষণের সংগঠিত প্রয়োগ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আগে বিশেষ চোখে পড়েনি, যদিও নেহেরু, নেতাজী, জয়প্রকাশ প্রমুখ অনেকেই কম-বেশি সমাজবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ দেশে সাম্যবাদী চিন্তার প্রসারে মানবেন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য। এমনকি মানবেন্দ্রনাথই হ'লেন প্রথম ভারতীয় যিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতে মার্ক্সবাদী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারাটির তিনিই স্রষ্টা। তাঁরই উদ্যোগে গঠিত হয় প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের বাধা ও নানা প্রতিকূলতাকে সহ্য করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারাটিকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যান। কোনও ধর্মীয় বা নৈতিক ভাবনা নিয়ে নয় ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চেতনা নিয়ে। অসাধারণ বিশ্লেষণী শক্তি দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন জাতীয় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, তার নেতৃত্বের বিবর্তন, ভারতীয় সমাজের শ্রেণী বিন্যাস, বিভিন্ন শ্রেণীর উত্থান, অবস্থান ও বিবর্তন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানবেন্দ্রনাথ দেখান যে, আধুনিক ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী মূলত জমিদার শ্রেণীরই রূপান্তরিত রূপ এবং ব্রিটিশ শাসনের ফলশ্রুতি। তবে এদের অর্থনৈতিক অসন্তোষকেই ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার করে গড়ে তুলতে হবে। গ্রামের শোষিত বঞ্চিত মানুষ কিভাবে একটি প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে তারও একটি চিত্র তুলে ধরেন রায়। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন স্বরাজ এলে এইসব গরীব মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নতি ঘটবে। তারা আগের থেকে খুশীতে থাকবে।

মানবেন্দ্রনাথ বস্তুবাদকে একটা দর্শন হিসাবে বিচার করেছেন। মার্ক্স বস্তুবাদে উৎপাদন-সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রায় একে আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করেছেন জীবনের শেষ প্রান্তে নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে। অতীন্দ্রিয় ভাববাদ সবসময়ই তাঁর কাছে পরিত্যাজ্য। মানবেন্দ্রনাথ মনে করেন, মার্ক্সবাদে মানুষের ভূমিকা ও তার চিন্তন প্রক্রিয়া উপেক্ষিত। রায় মনোজগৎকেও বস্তুর অন্তর্গত বলে মনে করেন, কারণ মানুষের আচরণ মনোবিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যার ভিত্তি হ'ল শারীরবিদ্যা ও রসায়ন। চিন্তামস্তিষ্কের ক্রিয়া যা স্বাধীন গতিতে অগ্রসর হয় এবং যা পক্ষান্তরে পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি ইতিহাসের জৈব প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

জীবনের শেষ প্রান্তে র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজ্‌মের তত্ত্বে বিশ্বাসী মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদকে পরিত্যাগ করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। মার্ক্সবাদ কোনও স্থিতিশীল তত্ত্ব নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে তাকে নতুনভাবে ব্যবহার করাই যায়। সংস্কার ও সংশোধন মানেই বিচ্যুতি নয়; বরং বলা যেতে পারে, স্বাধীনতার পূজারী মানবেন্দ্রনাথ যত না মার্ক্সবাদের বিরোধী ছিলেন তার থেকেও

বেশি বিরোধিতা করেছেন মার্ক্সবাদী আধিপত্যবাদ, গোঁড়ামি ও বিভ্রান্তিকে। ১৯৪৭ সালেও তিনি মার্ক্সবাদকে মানবজ্ঞানের এক উচ্চমানের দর্শন হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁর নবমানবতাবাদে তিনি উর্ধ্বে তুলে ধরতে চেয়েছেন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের পতাকাকে।

৪৫.৬ মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর নবমানবতাবাদ

সারাজীবন ধরে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিণতি স্বরূপ মানবেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্বে সন্ধান পেলেন এক নতুন জীবন দর্শনের, যার নাম Radical Humanism বা নবমানবতাবাদ। বিশ্বব্যাপী মানবতা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংকট, সাম্যবাদী ভাবনার অপপ্রয়োগ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয় রায়কে উদ্বুদ্ধ করে মানবতাবাদী জীবনাদর্শে। এই দর্শনের মূল সূত্রগুলি হ'ল যুক্তি, নীতি ও মুক্তি। ইউরোপের রেনেসাঁ, মানবতাবাদের উজ্জ্বল ভাবনাগুলি ছিল তাঁর চিন্তাভাবনার প্রধান খোরাক। এরই প্রভাবে তিনি লাভ করলেন যুক্তিবাদ, বিচারবোধ, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা; বুঝলেন মানুষই সব কিছুর একমাত্র পরিমাপক। স্বাধীনতার আকুতিই মানুষের অস্তিত্বের মূল কথা; আর সেই স্বাতন্ত্র্যবাদ মানুষের সৃজনশীলতাকে সম্মান করে। তিনি এই সিদ্ধান্তে আরও উপনীত হন যে, সারা বিশ্বের মানুষ একই মানবিক গুণসম্পন্ন হওয়ায় বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ব একটি স্বাভাবিক পরিণতি।

মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রকৃতি, মানুষ এবং নৈতিকতা এক অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ যার ভিত্তি হ'ল বিজ্ঞান সম্মত বস্তুবাদ। মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ। যেহেতু প্রকৃতির গতিপথ নিয়মনির্দিষ্ট সেই কারণে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদিও নিয়মনির্দিষ্ট — উভয় ক্ষেত্রেই এক মৌলিক শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। মানুষের নৈতিক আচরণের পিছনে তিনি কোনও অধ্যাত্মিক বা ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে নারাজ; তিনি মনে করেন বস্তুবাদী নীতিতত্ত্বই এর উৎস আর কেবল নীতি-নির্ভর সমাজদর্শনই পারে বর্তমান সভ্যতার সংকট থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। বস্তুত মানবেন্দ্রনাথ ভাব ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কে বিশ্বাসী।

৪৫.৭ দলহীন গণতন্ত্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হ'ল দলীয় রাজনীতি বর্জন। নিজের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখলেন, কি সংসদীয় গণতন্ত্র কি সমাজতন্ত্র সর্বত্রই ব্যক্তিস্বাধীনতা আজ তুচ্ছ ও গৌণ হয়ে পড়েছে। মানবেন্দ্রনাথ মনে করেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে যে নির্বাচন হয় তার ফলে ক্ষমতার কাছে জনপ্রতিনিধিরা আত্মসমর্পণ করায় শাসনের উপর জনগণের আর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা একধরনের প্রতারণা মাত্র। দলের কাছেই তাদের যাবতীয় দায়বদ্ধতা, মানুষের কাছে নয়। এর থেকেই উৎপত্তি যাবতীয় অনৈতিকতার। আর একনায়কতন্ত্র, তা সে যে ধরনেরই হোক্ না কেন গণতন্ত্রের বিকল্প হ'তে পারে না; কারণ তা' ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। তাই মানবেন্দ্রনাথের আহ্বান দল ব্যবস্থার অবসানের মধ্যে দিয়ে এক সক্রিয় সচেতন স্বশাসিত নাগরিক রাজনীতি গড়ে তোলার। তিনি চেয়েছিলেন,

সাড়া দেশ জুড়ে গণ কমিটির ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে পিরামিডাকৃতির রাষ্ট্রকাঠামো। সংসদ হবে তারই চূড়া। প্রতিটি নাগরিক দল-নিরপেক্ষ শিক্ষা ও প্রকৃত সমাজকল্যাণের চেতনা নিয়ে স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে গড়ে তুলবে তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা। তার ফলে রাষ্ট্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের স্থায়ী কর্তৃত্ব। এইভাবে গড়ে উঠবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকেই যায় যে, এভাবেই শক্তিশালী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের প্রভাব বিস্তার ও আধিপত্য বজায় রাখার সম্ভাবনা নির্মূল হবে কি?

৪৫.৮ সারাংশ

পান্ডিত্য ও মননধারায়, রাজনৈতিক কর্ম ও বিপ্লবী সংগঠনে মানবেন্দ্রনাথ এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। দেশ, কাল বা যুগের সীমানায় তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর মতো ব্যপক কর্মক্ষেত্র খুব কম মনীষীর জীবনেই দেখা যায়। স্বাধীনতা বা মুক্তির তীব্র আকাঙ্খা, নিয়ে কৈশোরে জাতীয়তাবাদ থেকে যৌবনে মার্ক্সবাদের মধ্যে দিয়ে অবশেষে নবমানবতাবাদে এসে তাঁর চিন্তন পরিণত রূপ লাভ করে। ভারতীয় রাজনীতিকে তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করেন। কোনও বাঁধাধরা ছকের গন্ডিতে আত্মসমর্পণ না করে এই অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে (যা মূলত ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত) জোরের সঙ্গে উপস্থাপিত করার কৃতিত্ব তাঁর।

তবুও ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি একজন বিতর্কিত পুরুষ। বলা হয়, চিন্তাধারার চাঞ্চল্যকর বিবর্তন সত্ত্বেও তিনি কোনও নতুন পথের সন্ধান দিতে পারেননি। তাঁর মানবতাবাদী চিন্তাধারাটি ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অঙ্গ যা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, জয়প্রকাশ প্রমুখের ভাবনায়। আরও বলা হয়, মানবেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ও সামাজিক গতি-প্রকৃতির যতই নির্ভুল বিশ্লেষণ করে থাকুন না কেন সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় তিনি সফল হ'তে পারেন নি। ফলে, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এসেছ একের পর এক ব্যর্থতা। সেই কারণে ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি নিঃসঙ্গ নায়ক।

তবুও তাঁর চিন্তাধারার অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। বর্তমান বিশ্বের প্রধান সংকট হ'ল মুক্তি আর মানবতার সংকট। আর সেখানে যুক্তি, নীতি ও মুক্তির আদর্শে রচিত মানবেন্দ্রনাথের, সমাজ দর্শন যে সে পথে আলো দেখাবেই সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

৪৫.৯ অনুশীলণী

১। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে লেনিনের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের বিতর্কের বিষয়টি উল্লেখ করুন।

২। ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের ধারণাটি বিবৃত করুন।

৩। মানবেন্দ্রনাথ 'দলহীন গণতন্ত্রের' পথে কেন গেলেন ? এটির সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

৪। মানবেন্দ্রনাথের 'নব মানবতাবাদের' ধারণাটি আলোচনা করুন।

৫। মানবেন্দ্রনাথের উপর মার্ক্সবাদের প্রভাব সম্পর্কে একটি টীকা রচনা করুন।

৬। একজন সফল রাজনীতিক হিসাবে মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

৪৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১) M. N. Roy — India in Transition

২) M. N. Roy — New Humanism

৩) M. N. Roy — Politics, Power and Parties

৪) M. N. Roy — Scientific Politics

৫) M. N. Roy — Reason, Romanticism a Revolution

৬) G. P. Bhattacharya — Evolution of the Political Philosophy of M.N. Roy

৭) B. N. Dasgupta — M.N. Roy's Quest for Freedom.

৮) V. P. Verma — Modern Indian Political Thought

৯) সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় — বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা

১০) দেবাশীষ চক্রবর্তী — ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা।

একক ৪৬ ☐ জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪)

গঠন

৪৬.০ উদ্দেশ্য

৪৬.১ প্রস্তাবনা

৪৬.২ জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক জীবন

৪৬.৩ উদারনীতিবাদ ও জওহরলাল নেহরু

৪৬.৪ জওহরলাল নেহরু ও সমাজবাদ

৪৫.৪.১ সমালোচনা

৪৫.৫ অনুশীলণী

৪৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন :

- জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক জীবন প্রবাহ
- উদারনীতিবাদ সম্পর্কে জওহরলাল নেহরুর ধারণা
- সমাজবাদ সম্পর্কে জওহরলাল নেহরুর বক্তব্য

৪৬.১ প্রস্তাবনা

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে ক'জন ব্যক্তিত্ব অমলিনভাবে বেঁচে থাকবেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪)। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। গান্ধীর নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা আন্দোলন পরাধীন ভারতে পরিচালিত হয়েছিল তার অন্যতম রূপকার ছিলেন তিনি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারায় যে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারা প্রবহমান ছিল, আরও বহু বরেণ্য নেতৃবর্গের সঙ্গে এই ধারার শ্রেষ্ঠ রূপকার ছিলেন তিনি। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই উদারনৈতিক ভাবধারাকে সংবিধানের মাধ্যমে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এরই সঙ্গে তিনি চেষ্টা করেছিলেন সমাজবাদ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা-চিন্তার মেলবন্ধন ঘটাতে। একই সঙ্গে রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক জওহরলাল নেহরুর প্রধান গ্রন্থসমূহ হ'ল : 'Soviet Russita : Letters from a Father to his daughter Glimpses of World History, The Discovery of India প্রভৃতি। এই এককে আমরা এই যুগপুরুষ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

৪৬.২ জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক জীবন

জওহরলাল নেহরুর জন্ম ১৪ নভেম্বর, ১৮৮৯ এলাহাবাদে। পিতা বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহরু, মা স্বরূপরাণী। তাঁর শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছে পিতা-মাতার আর্থিক ঐশ্বর্য ও অগাধ স্নেহে। ধনী ইংরেজের জীবনাযাত্রা ও আদবকায়দার অনুকরণে সন্তানকে গড়ে তুলতে হবে, এমনই ছিল মতিলালের ইচ্ছা। জওহর মানুষও হয়েছিলেন সেইভাবে। জীবনের প্রথম পনেরো বছর ইংরেজ গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করে তিনি চলে যান বিলেতে। প্রথমে হ্যারো স্কুল (১৯০৫-০৭), তারপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯০৭-১০) এবং শেষে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ (১৯১০-১২) তিনি পড়াশোনা করেছেন। লন্ডন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে তিনি দেশে ফেরেন ১৯২২ সালে।

দেশে ফেরার পর কিছুদিন আইনব্যবসা করেছেন, কিন্তু এর চেয়ে বড় কিছু করা যায় কিনা তা নিয়ে মানসিক অস্থিরতা ছিল নিরন্তর। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের নক্ষৌ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। বাল্যকাল থেকেই পিতা মতিলালের সঙ্গে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে তাঁর যাওয়ার অভ্যাস ছিল। ছাত্রজীবনে বিলেত প্রবাসকালে তিনি ইংল্যান্ডের র‍্যাডিকাল, প্রগতিশীল মতাদর্শ ও নেতৃবর্গের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগও পেয়েছিলেন। বার্নার্ড শ প্রমুখ মনীষীর ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র তাঁকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছিল। গান্ধীর সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় ঘটে তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হোমরুল পর্ড চলছে। ব্রিটিশ সরকার হোমরুলের নেত্রী অ্যানি বেশান্তকে নানাভাবে নির্যাতন এবং শেষে কারারুদ্ধ করে ১৯১৭ সালে। নেহরুর বেশান্তের ওপর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা, বেশান্তের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে তিনি হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এটাই তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের শুরু বলা চলে। এসময়ে তিনি কংগ্রেসের নরমপন্থী রাজনীতির বিরোধিতা করে তিলক-বেশান্তের অনুসৃত রাজনৈতিক পন্থার পক্ষে কাজকর্ম শুরু করেন। এর কিছুদিন পরেই গান্ধীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। জওহরলাল নিঃসঙ্কোচে গান্ধির অনুগামী হ'লেন। তাঁর নেতৃত্বের ছায়ায় নিজের সংগ্রামী জীবন গড়ে তুললেন।

১৯১৯ সালে দমনমূলক কালা-কানুন রাওলাট বিল পাশ হ'ল। গান্ধীজি সত্যাগ্রহ সভা প্রতিষ্ঠা করে এই আইনের বিরোধিতার জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন। সরকারের দমননীতি আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। পাঞ্জাবে ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগের জঘন্য হত্যাকান্ড। জওহরলাল তখন কংগ্রেস-কর্মী ছাড়াও পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত 'দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকার মুখ্য কর্ণধার। তীক্ষ্ণ ও তীব্র ভাষায় তিনি সরকারের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবে হত্যাকান্ড বিষয়ে জাতীয় কংগ্রেস যে অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করেছিল তার সদস্য হিসেবে পাঞ্জাবের নানা স্থান ঘুরে সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯২০ সালে নেহরু এলাহাবাদ জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নিযুক্ত হ'লেন। এরপর ধাপে ধাপে তিনি ১৯২৩-এ

সর্ব-ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক, ১৯২৮-এ সাধারণ সম্পাদক, ১৯২৯-এর লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর আরও ছ'বার নেহরু কংগ্রেস-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন — ১৯২৬-এ লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে, ১৯৩৭-এ ফৈজপুর অধিবেশনে, ১৯৪৬-এ আবুল কালাম আমাদের স্থলে, ১৯৫১-তে দিল্লি অধিবেশনে, ১৯৫৩-তে হায়দ্রাবাদে এবং ১৯৫৪-তে কল্যাণী অধিবেশনে। জওহরলালের আগে জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে তেমন কোনও শৃঙ্খলা ছিল না। খানিকটা এলেমেলো ও সাময়িক প্রয়োজন ভিত্তিক ছিল কাজকর্মের ধরন। জওহরলাল সাংগঠনিক কাজে শৃঙ্খলা আনেন এবং দলের হিসাবপত্র সঠিক পদ্ধতিতে রাখার ব্যবস্থাদি করেছিলেন। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক গণসংগঠণ গড়ে তোলার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা তাঁর শুরু হয় ১৯১৯-২১ এই দু'বছর উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার সময়। এই সময়ে অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। কারাবাসের অভিজ্ঞতাও শুরু হয়। ১৯২১ সালে প্রথম কারারুদ্ধ হন। পরবর্তী জীবনে মোট ন'বারে সবশুদ্ধ প্রায় নয় বছর তিনি জেলবন্দী ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অনুগত থেকে নেহরু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। উদার নৈতিক জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার মতাদর্শে তাঁর বিশ্বাস ছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় যুদ্ধরত সংগ্রামী মানুষের পক্ষে নেহরুর সমর্থন ছিল আকৃত্রিম। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের বিপক্ষে ভারতীয় প্রগতিশীলদের জেহাদকেও তিনি সংগঠিত করেছেন সুচারুভাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুর হবার পর পোলান্ডে নাভসি আক্রমণের নিন্দার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে এই সিদ্ধান্তও নিতে বাধ্য করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে ইংরেজদের যুদ্ধে সমর্থন করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

ইংল্যান্ডের বহু প্রগতিশীল, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট নেতা ও চিন্তাবিদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল নেহরুর। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের চিন্তাভাবনা ও কর্মোদ্যমগুলি সম্পর্কেও তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল অপরিসীম। ১৯৩৯ সালে জাতীয় কংগ্রেস ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করে। স্বাধীন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য কী কী কার্যক্রম এবং কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে কংগ্রেস দল — সেসব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা ছিল এই কমিটির উদ্দেশ্য। নেহরু এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নেহরু যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন, তা' ছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের। সোবিয়েত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনুকরণে তিনি চেয়েছিলেন এমন এক রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতি নির্মাণ করতে যেখানে ব্যক্তিগত বেসরকারি পুঁজির সঞ্চারণ থাকলেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সরকার; তাছাড়া সরকারি কর্তৃত্বে তৈরি হবে এক ব্যাপক রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন ব্যবস্থা। বস্তুত, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর চিন্তানুযায়ী কংগ্রেস দল এরকমই এক পরিকল্পনাধীন অর্থনীতির ভিত নির্মাণ করেছিলেন ব্যাপক ও দ্রুত শিল্পায়নের পথ গ্রহণ করতে, কারণ শিল্পায়নের গতির বিস্তার ঘটাতে না পারলে দেশের গরিবী দশা

ঘোচানোর অন্য উপায় তাঁর কাছে ছিল না। এই সূত্রেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গান্ধীজির অর্থনৈতিক চিন্তার সঙ্গে জওহরলালের চিন্তার এক দুস্তর ও মৌলিক পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজির দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের মতো সনাতন কৃষিপ্রধান দেশে ভারী শিল্পের প্রয়োজন সীমিত। কৃষির উন্নয়ন, সমবায়মূলক চাষবাস, অপরিগ্রহের আদর্শে উদ্বুদ্ধ শোষণহীন কৃষি-উৎপাদন কাঠামোতেই ভারতীয় মানুষের মুক্তির কথা চিন্তা করতে হবে; পশ্চিমী ব্যাপক শিল্পায়নের পথ ভারতের পথ নয়। কৃষির সাথে সাথে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য তৈরি করতে হবে অবশ্যই গ্রামীণ কুটির শিল্প, হস্তশিল্প কিংবা অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজনে আধুনিক কিছু কিছু শিল্প। কিন্তু পশ্চিমের অনুকরণে শিল্পায়নের মাধ্যমে আধুনিকতার ধারা গান্ধী অনুমোদন করেন নি। নেহরুর অর্থনৈতিক চিন্তা যে সম্পূর্ণ উল্টো পথেই চলছিল তা বহু ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়েছিল। এখানে ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তাঁর সভাপতির ভাষণ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক; 'কংগ্রেসের বর্তমান মতাদর্শের সঙ্গে সমাজবাদ কি খাপ খায়? আমরা মনে করি না খাপ খায়। দেশের দ্রুত শিল্পায়নে আমি বিশ্বাসী, আমার মতে একমাত্র সে পথেই জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ভালভাবে উন্নত হ'তে পারে এবং দূর হ'তে পারে দারিদ্র্য। তবুও অতীতে আমি সর্বান্তঃকরণে খাদি কর্মনীতির সঙ্গে সহযোগিতা করেছি এবং আশা রাখি ভবিষ্যতেও করব কারণ আমি মনে করি খাদি ও পল্লীশিল্পের একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে আমাদের এখনকার অর্থনীতিতে। .... কিন্তু ওইগুলিকে আমি দেখি আমাদের জীবন্ত সমস্যাগুলির সমাধান হিসাবে নয়, মধ্যবর্তী স্তরের সাময়িক পদ্ধতি হিসাবেই।' (ভাষণের এই অনুবাদ নেওয়া হয়েছে 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত : আলেখ্য গ্রন্থ' থেকে)।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশে-বিদেশে নানা ঘটনার আবর্তে থেকে জওহারলাল দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যুদ্ধ, দেশভাগ, মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির ফলে জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। ওদিকে কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি সামন্ত রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির প্রশ্নে ক্রমাগত রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি, উপজাতীয় সমস্যাগুলির বিদ্রোহ, গান্ধী হত্যা, সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ইত্যাদি আরও হাজারো সমস্যা স্বাধীন ভারতের সরকারি প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। পাশাপাশি ছিল দীর্ঘকালব্যাপী ঔপনিবেশিক লাঞ্ছনা জর্জরিত অর্থনীতির পুনর্গঠনের সমস্যা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রম-প্রসারমান ঠান্ডা যুদ্ধের আবহাওয়াও ছিল ভারতের প্রগতির পক্ষে এক বড় প্রতিবন্ধক। এসবের মোকাবিলা করতে করতেই দীর্ঘ সতেরো বছর নেহরুর প্রধানমন্ত্রীত্বের কাল শেষ হয়েছে। দেশীয় ক্ষেত্রে নেহরুর সময়কালে জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাশ হয়েছে, সংবিধানে ধর্মনিরেপক্ষতার আদর্শকে মুখ্য বিষয় করে তুলে ধরা হয়েছে এবং এক মিশ্র অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরি হয়েছে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন, অস্পৃশ্যতাবিরোধী আইন, ভূরী দেশীয় শিল্পের বেশ কিছুর জাতীয়করণ ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সালে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন স্থাপনও নেহরুর চিন্তাপ্রসূত। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন দু'টি বিশেষ বিষয়ের প্রতি —

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে সহায়তা করা। মার্কিন-রুশ শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে, সেসব যুদ্ধ-পরিস্থিতি আর্ন্তজাতিক শান্তি ও নিরপত্তাকে বারবার বিঘ্নিত করে তুলেছিল, নেহরুর নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি তারই মোকাবিলায় গড়ে তুলেছিল জোট নিরপেক্ষতার স্লোগান। বিশ্বের শান্তিবাদী আন্দোলনেরও অন্যতম নেতা ছিলেন তিনি। আণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও প্রসারের বিরুদ্ধে তাঁর নিরন্তর অভিযান বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও মৃত্যুর দু'বছর আগে ১৯৬২ সালে চিন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ তাঁকে বিহ্বল করেছিল এবং কাশ্মীর ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার পটভূমিতে পাক-ভারত সম্পর্কের ক্রমাবনতিও তাঁর উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছিল। ১৯৬৪ সালে জওহরলাল নেহরুর জীবনাবসান ঘটে।

৪৬.৩ উদারনীতিবাদ ও জওহরলাল নেহরু

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারায় মূল যে-স্রোতটি বহমান ছিল, তা হ'ল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারা। আরও বহু বরেণ্য নেতৃবর্গের সঙ্গে এই ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার ছিলেন জওহরলাল নেহরু। একথা কেবল স্বাধীনতা-প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত প্রযোজ্য, তা কিন্তু নয়। স্বাধীনতার পর নব-ভারতের আর্য-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকেও গড়ে তুলেছিলেন নেহরু।

নেহরুর জাতীয়তাবাদের স্বরূপ কী — এই প্রশ্ন যদি উত্থাপন করা যায়, তাহলে বিষয়টিকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। মূলত বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব; কিছুটা সরল করে একথা বলা যায়। জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিকাশ ঘটেছিল প্রথমে ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতকে। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই অল্পে অল্পে জাতীয়তাবাদ তৈরি হ'তে শুরু করেছিল। ফরাসী দেশের সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাজার শাসনের বিরুদ্ধে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবেও জাতীয়তাবাদের বিচ্ছুরণ দেখা গেছে। আমেরিকাতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন মার্কিন জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করেছে। এই সবকটি দেশেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের সূত্রে উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে উঠেছে, স্পষ্ট করেই সেকথা বলা যায়। ইটালি, জার্মানি, জাপান ইত্যাদি দেশগুলিতেও আধুনিক জীবনধারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের হাত ধরে। অতএব, ইউরোপ-আমেরিকায় সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত সর্বপ্রধান ও সর্বশক্তিমান মতাদর্শ হ'ল জাতীয়তাবাদ এবং ওই মতাদর্শের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল বিকাশমান পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা। সমাজের নতুন প্রগতিশীল উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণী জাতীয়তাবাদের মোড়কে তাঁদের অপ্রতিহত রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতা গড়ে তুলেছে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যখন জাতীয়তাবাদ প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল,

বিশেষত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে নেহরু যখন আন্দোলনের হাল ধরলেন, তখন বিশ্বের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেছে— রুশদেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বকালের শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর জাগরণ ঘটে গেছে। রুশ সমাজতন্ত্রে মতাদর্শ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে। এহেন এক পটভূমিতে আধুনিক বিলাতি শিক্ষায় শিক্ষিত এ বিশ্ব-ইতিহাস-সচেতন জওহরলাল ভারতের জাতীয় সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। উপরন্তু, তিনি এসেছিলেন গান্ধীর হাত ধরে। গান্ধী এই সময়কাল থেকেই ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের গণভিত্তি রচনার কাজে মগ্ন ছিলেন। এতদিন কংগ্রেসের আন্দোলন ছিল শিক্ষিত, উচ্চবর্গ ও খানিকটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর করতলগত। গান্ধী কৃষক-শ্রমিক-কারিগ শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে জাতীয়তার সংগ্রাম বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের যোগসাধনে সচেষ্ট হ'লেন। কংগ্রেসের আন্দোলন এক নতুন চরিত্র ধারণ করল। নেহরু এরকম এক পর্বে তাঁর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক — এই ঘোষণা করলেন। ঘোষণা সত্ত্বেও তাঁর জাতীয়তাবাদ কতখানি সমাজতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পেরেছিল, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ, এই শতকের বিশ-তিরিশ-চল্লিশের দশকে জাতীয় কংগ্রেস ছিল এক বিস্তৃত পরিসরের মঞ্চ — নানা ধারার আন্দোলন, নানা মতাদর্শের মানুষ এসে জড়ো হয়েছিলেন এই মঞ্চে। বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ, (যাকে ইংরেজ শাসকরা বলতেন সন্ত্রাসবাদ) রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ, গান্ধীবাদ, সমাজতান্ত্রিক মনোভাব, কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি নানা স্রোতের সম্মেলন কংগ্রেস। নেহরু সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী অথচ তিনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ১৯৩৪ সালে যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল তৈরি হয়, তার সম্পর্কে সংবেদনশীল হ'লেও তিনি তাতে যোগ দেন না। এই কালে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব স্বীকার করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও তৈরি হয়ে গেছে। নেহরু মার্ক্সবাদ বিষয়ে আগ্রহী, অনেক বিষয়ে তিনি মার্ক্সপন্থী, এমনকি রুশ সমাজতন্ত্রের পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত, অথচ তিনি ভারতের কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলেন। অন্যদিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিত্তবান ভূস্বামী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের স্বার্থের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সংঘাত ঘটে কিন্তু সহাবস্থান মেনে নেন তিনি শেষ পর্যন্ত। তিনি গান্ধীজির প্রতি তীব্রভাবে অনুরক্ত, তাঁর নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ আনুগত্য পোষণ করেন, অথচ গান্ধীদর্শনের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্যের কথা তিনি নিজেই বারবার ব্যক্ত করেন। এই অদ্ভুত স্ববিরোধের মধ্যে যেটা লক্ষ্যণীয় তা হ'ল এই যে, জওহরলাল বৌদ্ধিক দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার শরিক হ'লেও বিচিত্র শক্তির আধার কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতার ভূমিকা পালন করেছেন। কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যেমন লড়াই করতে হয়েছে, অন্যদিকে মুসলিম লীগের সঙ্গেও যুঝতে হয়েছে। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসি নেতাদের সঙ্গে লড়তেও হয়েছে; আবার আপসও করতে হয়েছে পদে পদে। পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিকের ভূমিকায় থাকলে এই আপস তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না। এই দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, জওহরলাল ছিলেন কংগ্রেসের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সমন্বয়কারী উদারনীতিবাদী।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নবভারতের রূপকার জওহরলাল নেহরু। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদী। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের ধাঁচে গড়ে উঠেছে এই সংবিধান। গণসার্বভৌমত্ব, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, বহুদলব্যবস্থা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাষ্ট্র, রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র, স্বাধীন নিরপেক্ষ আদালতের গুরুত্ব ইত্যাদি আধুনিক উদারনৈতিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এই সংবিধানের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন সংবিধান রচয়িতা। গণপরিষদের সভাপতি এবং সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ড. আম্বেদকার। এছাড়া ছিলেন বহু জাতীয়তাবাদী প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদরা। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই তৈরি হয়েছে ভারতীয় সংবিধান; কিন্তু গণ-পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস দলের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন পন্ডিত নেহরু। তাঁর উদারনৈতিক চেতনা, মানবতাবাদী দর্শন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রত্যয় এবং সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিকতার স্বপ্ন সংবিধানের নানা ধারায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রাজনীতির সঙ্গে ধর্মচেতনা মিশিয়ে ফেলার সর্বপ্রকার চেষ্টার বিরুদ্ধে ছিলেন জওহরলাল। বিজ্ঞাননিষ্ঠ বস্তুবাদী নেহরু মনে করতেন যে, ধর্ম ও রাজনীতির মেলবন্ধনে মধ্যযুগীয় মূল্যবোধগুলি তৈরি হয়। আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ মনুষ্য সভ্যতায় সেই মূল্যবোধের জাতীয়তাবোধ সম্পূর্ণ বেমানান শুধু নয়, চরম অনিষ্টকারী। নেহরু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় চেতনাসম্ভূত দ্বিজাতিতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করেছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলার জন্য তাঁর লড়াই যুগান্তকারী। কেবল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নয়, ভারতে জাতপাতের সমস্যা, জাতিভেদপ্রথা ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক কলহও অতি প্রাচীন। নেহরু এবং এ-বিষয়ে আরেক সংগ্রামী পুরুষ আম্বেদকার জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করেছেন; সংবিধানে সেই লড়াইয়ের বেশ কিছু সাক্ষ্য রয়েছে।

গণতন্ত্র মানে বিচিত্র মতের সমাহার, বৈচিত্রের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। এর জন্য গণতন্ত্রের সর্বপ্রধান শর্ত হ'ল বাক্‌স্বাধীনতা ও মুদ্রণ যন্ত্রের স্বাধীনতাকে। পার্লামেন্টে বিরোধী দলগুলিকে যথাযথ সম্মান দেওয়া এবং জাতীয় সংকট মোচনে তাদের সাহায্য গ্রহণ করাও গণতন্ত্রের আদর্শ। পন্ডিত নেহরু তাঁর সতেরো বছর প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে এই শর্তগুলি বিষয়ে যথেষ্ট সাবধাণী ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে এক বলিষ্ঠ সংসদীয় গণতন্ত্রের সোপান রচিত হচ্ছিল, একথা বলা হয়।

কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে না উঠলে উদারনৈতিক রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি হ'তে পারে না। নেহরুর অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার সামান্য বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে জরুরি। নেহরুর মূল ঝোঁক সমাজতন্ত্রের দিকে থাকলেও তিনি স্বাধীন ভারতে মিশ্র অর্থনীতির বনিয়াদ তৈরি

করেছিলেন। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের নেতৃত্বে শিল্প-বাণিজ্য গঠনে তাঁর উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল; তেমনি পাশাপাশি বেসরকারি পুঁজির ক্রমবর্ধমান সঞ্চরণেও তিনি বাধা দেননি। রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রেটিকে মজবুত করার জন্য তাঁর উদ্যোগেই কিছু ভারীশিল্পের জাতীয়করণ ঘটেছিল। ইস্পাত শিল্প, কয়লা শিল্প, বিদ্যুৎ, জীবনবীমা, রেলপথ ইত্যাদির জাতীয়করণ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরপরই ঘটেছে। বেসরকারি পুঁজির সঞ্চরণও যাতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে তার ব্যবস্থাও নেহরুর অর্থনৈতিক কাঠামোর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ, সামন্ত রাজন্যবর্গের রাজ্যলোপ, ভূসম্পত্তির ওপর সিলিং প্রথা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে নেহরু যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষণযুক্ত উদারনৈতিক কাঠামো বলা সঙ্গত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নেহরু ভারতে এই ধরনের অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য সোবিয়েত প্রবর্তিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিশনকে ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে ক্ষমতা দিয়েছিলেন। ফলে পরিকল্পিত এক অর্থনীতির মাধ্যমে তিনি ভারতকে একদিকে দ্রুত শিল্পায়নের পথে নিয়ে গেলেন এবং মিশ্র অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বনিয়াদ তৈরি করে গেছেন।

পন্ডিত নেহরুর বিদেশ নীতিও তাঁর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আরেক বিশিষ্ট প্রকাশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠান্ডা যুদ্ধের পরিবেশে আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক। এশিয়া-আফ্রিকার অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দ্বিমেরুবিভক্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তুলতে। মূলত তাঁর চেষ্টা ও পরিকল্পনামত এই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং সেই আন্দোলন আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে ছিল। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বহুমুখী। পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলির বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ রচনা করা, উন্নতিশীল তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তৈরি করা ইত্যাদি ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচি। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে পন্ডিত নেহরুর যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার বলিষ্ঠ মনোভাব এবং অপেক্ষাকৃতভাবে পিছিয়ে থাকা দেশগুলির আত্মমর্যাদা স্থাপনের গণতান্ত্রিক চেতনা পরিস্ফুট হয়েছে।

৪৬.৪ জওহরলাল নেহরু ও সমাজতন্ত্রবাদ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, রাজনৈতিক জীবনের প্রায় শুরু থেকেই নেহরুর ঝোঁক ছিল অতি প্রবল। ১৯২৩-৩০ সালে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে জওহরলাল বলেছিলেন, পৃথিবীব্যাপী সমাজের সমগ্র কাঠামোর ভিতর সমাজবাদের দর্শন ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হয়েছে এবং প্রায় একমাত্র বিতর্কিত

প্রশ্ন হচ্ছে এই দর্শন কত দ্রুত ও কী পন্থায় রূপায়িত হবে। ভারতকেও সেই পথে যেতে হবে যদি সে তার দারিদ্র্য ও অসাম্য দূর করতে চায়, যদিও সে তার নিজস্ব পন্থা বের করতে ও নিজস্ব জাতিগত প্রতিভা অনুসারে আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে।' এই বক্তব্যই আরও জোরদার রূপে ব্যক্ত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ ও ফৈজপুরের কংগ্রেসগুলিতে। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, ছাত্রজীবন থেকেই নেহরু মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইংল্যান্ডের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও তাঁর প্রত্যক্ষত পরিচয় ঘটেছিল এবং সেখানকার পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এর ফলে আরও বেড়ে গিয়েছিল। যদিও মার্ক্সবাদের সবকটি মৌল প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল না। তিনি শ্রেণীযুদ্ধ ও হিংসায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। তিনি অনুসরণ করেছিলেন গণতান্ত্রিক সমাজবাদের শান্তিপূর্ণ আইনগত ধারায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। এমনকি মার্ক্সবাদী দর্শনের মৌলিক ভিত্তি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন সম্পর্কেও তাঁর দ্বিধা 'দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া', নামক গ্রন্থে নেহরু স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন — 'মার্ক্সবাদ আমাকে সম্পূর্ণ তুষ্ঠ করতে পারেনি অথবা আমার মনে যেসব প্রশ্ন উদয় হয় তার সবগুলির উত্তরও দিতে পারে না এবং প্রায় অজ্ঞাতসারে আমার মনে একটা অস্পষ্ট ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি উঁকি দেয় যা অনেকটা বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি। এটা মন ও বস্তুর পার্থক্য নয় বরং এমন একটা কিছু যা মনেরও বাইরে রয়েছে।'

সোবিয়েত দেশের শিল্পায়নের দ্রুতগতি, সমবায় প্রথায় কৃষি উৎপাদন, পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরের অভাবনীয় পরীক্ষা নেহরুকে মুগ্ধ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তারই পাশাপাশি মার্ক্সবাদী পন্থায় সমষ্টিগত কর্তৃত্ব বা সরকারি কর্তৃত্বের যে চরম শৃঙ্খলা ও ক্ষমতা ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার নীতি, তা' নেহরু মেনে নিতে পারেন নি। 'দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' - তেই তিনি লিখেছিলেন, 'আমি অতিমাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং আমি কঠোর শৃঙ্খলার (Regimentation) চাইতে ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী'। এইসব কিছু থেকেই স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে, নেহরু মার্ক্সবাদ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন ঠিক কথা; কিন্তু তিনি মার্ক্সবাদী নন; বরং তাঁর বিভিন্ন রচনা, বিবৃতি, বক্তৃতা এবং কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তিনি বিশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির কার্যক্রম ও তাঁদের দর্শন গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে আশ্রয় করেই ভারতীয় সমাজের রূপান্তর ঘটাতে চান।

নেহরুর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সভাপতি আচার্য নরেন্দ্র দেব বলেছিলেন, 'নেহরুর সমাজদর্শন সম্পর্কে আমাকে যদি এক কথায় উত্তর দিতে হয়, তাহলে আমি বলব যে, তাঁর দর্শন হ'ল গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'। নেহরু ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের পর্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের দর্শন ঢোকাবার প্রাণপন চেষ্টা করেছেন; সর্বত্রই যে জয়ী হয়েছেন তা বলা না গেলেও একটা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আবহ তৈরি করতে পেরেছিলেন এটুকু বলা যায়। উদারনৈতিক গণতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক পথে না গেলে যে প্রকৃষ্ট গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে

না — একথা খানিকটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে নেহরু যে-উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রচনা করেছিলেন ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠনের জন্য সেগুলি ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তিতে দ্রুত শিল্পায়ন, পরিকল্পনাভিত্তিক রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র (Public Sector) বিস্তৃত করে তোলা, সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বচ্ছন্দ বিকাশ করা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসন করা এবং ভারতীয় ভূমিব্যবস্থার সার্বিক সংস্কারের দিকে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করতে গিয়ে জওহরলালকে বিস্তর সমস্যার মুখোমুখি হ'তে হয়েছে। বিশেষত শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যেই ছিল রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গের নিরবচ্ছিন্ন বাধা। নেহরুকে সবসময়েই দলীয় ঐকমত্যের জন্য মাঝামাঝি রাস্তা নিতে হয়েছে, গ্রহণ করতে হয়েছে সমঝোতার পথ। ভারতীয় সমাজবিকাশের জন্য এই পথকে পুরোপুরি পুঁজিবাদী পথ বা পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক পথ — কোনটিই বলা যাবে না। সে-পথ ছিল গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মতো এক উদারনৈতিক মধ্যপন্থা।

উন্নয়ন বিষয়ে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচি বিশ্লেষণ করে সূত্রাকারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির কথা বলা যায়। ১) দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ব্যাপক ভূমি সংস্কার। স্বাধীনতার পরেই তাই জমিদারি ব্যবস্থা অবলুপ্ত করা হয়েছিল বিশেষ আইন প্রণয়ন করে। ভূসম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। আর শিল্পের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে বৃহদায়তন শিল্প নির্মাণে গতিবেগ তীব্র করা হ'ল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। বেশ কয়েকটি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হ'ল বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তা নিয়ে। জাতীয় করণ করা হ'ল রেল, কয়লা, বীমা জাতীয় বেশ কয়েকটি শিল্প সংস্থা। ২) উৎপাদনের বিষয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র ও এক্তিয়ার বিস্তৃত করা হল বটে, কিন্তু বেসরকারি, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিনিয়োগের ক্ষেত্রকেও টিকিয়ে রাখা হ'ল। তৈরি হ'ল মিশ্র অর্থনীতির বনিয়াদ। নেহরু বলেছিলেন, এই মিশ্র অর্থনীতি তৈরি করতে হবে এক মিশ্র মতাদর্শের ভিত্তিতে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মালিকানার যৌথ উদ্যোগেও শিল্প রচনা করতে হবে। আর যেসব শিল্প-বাণিজ্য পুরোপুরি বেসরকারি মালিকের হাতে থাকবে, সেগুলিকেও লাইসেন্স ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখবে সরকার। ৩) দ্রুত শিল্পায়নের জন্য চাই কারিগরি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবসম্পদ। এই মানবসম্পদ তৈরির জন্য প্রয়োজন দেশজোড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা; শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলার নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন। ৪) অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে হবে সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে। এই ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মসংস্থানের আয়োজন করা যাতে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়। আর তারই পাশাপাশি দরকার ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ-বন্টন ব্যবস্থা। জাতীয় সম্পদ বন্টনের জন্য চাই সমতার আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি। ৫) নেহরুর মতে, এই পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মূল কেন্দ্র হিসাবে পরিকল্পনা কমিশনকে তাই দেওয়া হ'ল পর্যাপ্ত ক্ষমতা। ছয়,

পরিকল্পিত অর্থনীতির দ্রুত রূপায়ণের জন্য চাই গণউদ্যোগ ও সর্বস্তরে গণঅংশগ্রহণের ব্যবস্থা। এই সূত্রেই তৈরি হ'ল ব্লক উন্নয়নের জন্য ব্লকস্তরে প্রশাসনিক কাঠামো, গ্রাম ও জেলাগুলির জন্য পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা।

৪৬.৪.১ সমালোচনা

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নেহরুর এই পরিকল্পিত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বাধীন ভারতের নতুন এক কাঠামো তৈরি করেছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন যথাযথভাবে রূপায়িত হ'তে পেরেছিল, একথা বলা যাবে না। সমালোচকরা নানা দিক থেকে বিষয় নিয়ে বিবেচনা করে যেসব কথা বলেছেন, তার দুএকটা উল্লেখ করা যাক। প্রথমত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও গবেষক ভাম্বরি লিখেছেন যে, নেহরুর মিশ্র অর্থনীতি রাষ্ট্রায়াত্ত মালিকানার চাইতে অনেক বেশি ব্যক্তি মালিকানার পুঁজি তৈরি করেছে। দ্রুত ও ব্যপক শিল্পায়নের মোহে নেহরু এতোটাই আপ্লুত ছিলেন যে, ব্যক্তি মালিকের হাতে পুঁজির কেন্দ্রিভবন অনিবার্যভাবে ঘটেছে। তৈরি হয়েছে একচেটিয়া পুঁজি। দ্বিতীয়ত, নেহরুর প্রখ্যাত জীবনীকার এস. গোপাল লিখেছেন, দেশে প্রকৃত সামাজিক ন্যায্য প্রতিষ্ঠার জন্য উৎপাদন ও বন্টন প্রক্রিয়ার সুব্যবস্থা একই সঙ্গে ও একই তালে তৈরি করতে হবে; প্রযুক্তিগত উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামাজিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় রদবদল করতে হবে এবং উৎপাদনবৃদ্ধি ও সমতার আদর্শে বন্টনব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে — কিন্তু নেহরুর পরিকল্পিত অর্থনীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এসবের অনুপস্থিতি অত্যন্ত প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। তৃতীয়ত, নেহরুর চিন্তায় উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্য দ্রুত শিল্পায়ন এক মোহ তৈরি করেছিল। সনাতন কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষে কৃষির ক্ষেত্রে যেসব অগ্রাধিকার স্বাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে প্রয়োজন ছিল, তাকে নেহরু ততোটা গুরুত্ব দেননি। ফলে সম্পদ বিলিব্যবস্থার ক্ষেত্রে অসাম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব সমালোচনা সত্ত্বেও সমাজবিজ্ঞানী মহলে এ-বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে, স্বাধীন ভারতের জাতিগঠনের প্রয়াসে ও রাষ্ট্রকাঠামোর আধুনিক ভিত গঠনে পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর চিন্তা ও কর্মধারা এক বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য ইতিহাস।

৪৬.৫ অনুশীলণী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

২. জওহরলাল নেহরুর উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক চিন্তার চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।

৩. গণতান্ত্রিক সমাজবাদী হিসেবে নেহরুর চিন্তা ও কর্মকান্ড কী ও তা কতদূর সফল হ'তে পেরেছে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১. নেহরু ও গান্ধীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দু'টি পার্থক্য বর্ণনা করুন।

২. নেহরুর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে আচার্য নরেন্দ্র দেবের বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

৩. মিশ্র অর্থনীতি বলতে নেহরু কী বুঝিয়েছিলেন ?

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ

১. জওহরলাল নেহরু লিখিত দু'টি বইয়ের নাম লিখুন।

২. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে জওহরলালের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় পাওয়া যায় ?

৩. ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সোভিয়েত রাশিয়ার কোন্ পদ্ধতি নেহরু অনুকরণযোগ্য মনে করেছিলেন?

৪৬.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. V. Grover (ed.) Political Thinkers of Modern India, Volume on J. Nehru.

২. J. Nehru : The Discovery of India.

৩. K. P. Karnnakaran : The Phenomenon of Nehru.

একক ৪৭ □ সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫)

গঠন

৪৭.০ উদ্দেশ্য
৪৭.১ প্রস্তাবনা
৪৭.২ সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবন
৪৭.৩ জাতীয়তাবাদ ও সুভাষচন্দ্র
৪৭.৪ সমাজতন্ত্র ও সুভাষচন্দ্র
৪৭.৫ অনুশীলণী
৪৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন

- সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবনের রূপরেখা
- জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্য ও
- সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বসুর ধারণা

৪৭.১ প্রস্তাবনা

ভারতের রাজনৈতিক ইহিহাসে যে ক'জন ব্যক্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন সুভাষচন্দ্র বসু তাঁদের অন্যতম। অনতিদীর্ঘ জীবনে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য মাত্রা এনে দিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের সহযোগী হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু করেন তিনি তা' শেষ হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। শুধু প্রত্যক্ষ রাজনীতিই নয় দার্শনিক ও চিন্তাবিদ হিসাবেও সুভাষচন্দ্রের উল্লেখ দাবী রাখে। তাঁর রচিত 'তরুণের স্বপ্ন' ও Indian Struggle তদানীন্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এই এককে আমরা জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্য আলোচনা করব।

৪৭.২ সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবন

১৮৯৭ সালের তেইশে জানুয়ারি কটকে সুভাষচন্দ্রের জন্ম। পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী, মা প্রভাবতীদেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে সুভাষচন্দ্র কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু

১৯১৬ সালে কলেজের সাহেব অধ্যাপক ওটেনকে নিগ্রহ করার অভিযোগে তিনি বহিষ্কৃত হন এবং ১৯১৯ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে বিলেতে যান আই. সি. এস হতে। সেখানে সসম্মানে আই. সি. এস পরীক্ষায় পাশ করেন, কিন্তু বিদেশী সরকারের গোলামি করবেন না — এই মনোভাব তৈরি হওয়ায় ১৯২১ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন। ছাত্রজীবন থেকেই স্বাজাত্যবোধ তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল। ওটেনসাহেব ভারতীয়দের বিষয়ে অপমানসূচক কথাবার্তা বলতেন বলেই সুভাষ তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি প্রবেশ করেন তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার অন্যতম অপ্রতিদ্বন্দী নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের হাত ধরে। চিত্তরঞ্জনের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন তিনি। ১৯২১ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার পর সরকার তাঁকে ছমাসের জন্য কারারুদ্ধ করে। এরপর তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে মোট এগারোবার কারারুদ্ধ হয়েছেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি মুক্তি পেয়েছেন ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য। কংগ্রেসে যোগ দেবার পর প্রথম দু'বছর অসহযোগ আন্দোলনে নিষ্ঠাবান কর্মীর দায়িত্ব পালন ছাড়া সুভাষ জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা, 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা পরিচালনা ও কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের অধিকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। এই সময়কালে চিত্তরঞ্জনের কাছে শিক্ষানবিশী ছাড়াও তিনি গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছেন। ১৯২২ সালে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ প্রত্যাহার করে নিলে চিত্তরঞ্জন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে, ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার অনুযায়ী প্রাদেশিক কাউন্সিল বয়কট না করে বরং তাতে ঢুকে ভিতর থেকে কাউন্সিলকে অচল করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা উচিত। গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে এ-বিষয়ে মতান্তরের ফলে ১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন-মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল তৈরি হয়। ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দল প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে আশাতীত সাফল্য লাভ করে শক্তিশালী দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ওই বছরেই চিত্তরঞ্জন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন এবং সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়েই বাংলাদেশে বিপ্লবী জাতিয়তাবাদের কর্মীদের কাজকর্ম বৃদ্ধি পেয়েচিল, কংগ্রেস বা স্বরাজ্যদল সেসব কাজকর্মকে অনুমোদন না করলেও বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল এবং সরকার সেই কারণেই তাঁকে ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত করেছিলেন বছর দুয়েকের জন্য। বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষের সম্পর্ক বরাবরই অক্ষুন্ন ছিল।

১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এর বেশ কিছু আগেই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর সুভাষের বিভিন্ন রক্তৃতা ও কাজকর্মে যে মনোভাব ফুটে উঠেছিল তা হ'ল-এই যে, কংগ্রেসকে বিকল্প সরকারের মতো গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিক

কৃষককে সচেতন করে আন্দোলনে শামিল করতে হবে এবং জনশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। দেশ ও জাতিকে আত্মশক্তিসম্পন্ন করে তুলে ব্রিটিশ শাসনকে পঙ্গু করে দিতে হবে, তৈরি করতে হবে দেশীয় প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্ত কাঠামো। তিনি এই সময় থেকেই ডোমিনিয়ন স্টেটাসের পরিবর্তে পূর্ণ স্বরাজের কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিলেন। ১৯২৭ সালের শেষের দিকে জওহরলালের সঙ্গে সুভাষ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এবং ১৯২৮ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে তিনি এক অভূতপূর্ব সামরিক কায়দায় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন। দেশের ছাত্র-যুবমহলে বিশেষ উদ্দীপনা তৈরি হয়। ১৯২৮-এর এই কংগ্রেসেই নেহরু ও সুভাষ পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব নিয়ে আসেন, তবে কংগ্রেস তা, অবশ্য মেনে নেয় নি। ১৯২৯ সালে সুভাষ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন।

তিরিশের দশক সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯৩০ সালে তিনি গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন এবং কারারুদ্ধ হন। ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির মধ্য দিয়ে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহৃত হ'লে সুভাষ মুক্তি পান, কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে আবউইন চুক্তি বিষয়ে তাঁর মতপার্থক্য ঘটে এবং অচিরেই তাঁকে আবার আটক করা হয়। গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন মুলতবি ঘোষণার পর সুভাষচন্দ্র ও বিঠলদাস এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তাঁরা বলেছিলেন, 'আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে মহাত্মা গান্ধী শেষ যে কান্ড করলেন তাতে মেনেই নেওয়া হ'ল যে, কংগ্রেসের বর্তমান পদ্ধতি অচল। আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ। সুতরাং, সময় এসেছে এখন নতুন নীতির ওপর নতুন পদ্ধতিতে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাবার। কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করতে হ'লে নেতৃত্বের বদল হওয়া দরকার।' আরইউন চুক্তির বিরোধিতার কারণে তিনি গ্রেপ্তার হবার পর স্বাস্থ্যহানির কারণে বছরখানেকের মধ্যেই তিনি মুক্ত হন এবং চিকিৎসার কারণে বিদেশে চলে যান। প্রায় চারবছর ইওরোপের বিভিন্ন দেশে তিনি তখন ছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯৩৩ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলন। ওই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র সাম্যবাদী সংঘ গঠন ও তার কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। এই প্রবাস-জীবনেই ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হল তাঁর লেখা গ্রন্থ 'Indian struggle'।

সরকারি নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ১৯৩৬ সালে সুভাষ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেপ্তার হন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সাতটি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে তিনি মুক্তি পান। এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে, তারই প্রভাবে ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। গান্ধীজির প্রস্তাবেই তিনি সভাপতি হয়েছিলেন কিন্তু গান্ধী-প্রদর্শিত পথ ও মতের সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে মিল থাকলেও অমিলের অংশ ছিল বেশি। তিনি আপস-ভিত্তিক আন্দোলনের পরিবর্তে কংগ্রেসকে বিপ্লবী পথে পরিচালনা করার কথা বলতে থাকেন এবং এই সময়েই

তিনি কংগ্রেসের পক্ষে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেছিলেন। এই পরিকল্পনা কমিটি গঠনের চিন্তার ক্ষেত্রে রুশ বিপ্লব ও সোবিয়েত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়গুলির প্রভাব ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে তিনি পুনর্বার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এই কংগ্রেসে গান্ধী চাননি যে সুভাষ আবার সভাপতি হয়ে ফিরে আসেন, তিনি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করলেন যে সীতারামাইয়ার পরাজয় তাঁর পারজয়। বস্তুত সভাপতিপদে বৃত হওয়ার পর সুভাষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন পাননি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সভাপতিপদ থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৩৯ সালের মে মাসে কংগ্রেসে ব্যক্তিপ্রাধান্যের বিপরীতে গণতান্ত্রিকতার ভিত প্রতিষ্ঠার জন্য এবং কংগ্রেসকে জনগণের বৈপ্লবিক হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী শক্তিগুলিকে একত্রিত করার জন্য তিনি Left Consolidation Committee এই সময় তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বস্তুত ভারতে বামপন্থী আন্দোলনে বহু গোষ্ঠী ও বিচিত্র মতাদর্শের অস্তিত্ব প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই; কোনও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তাই সফলভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। কমিউনিস্ট ইন্ট্যারন্যাশনাল ও সোবিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্টরা। কংগ্রেসের সোস্যালিস্ট নেতৃবর্গ, সুভাষচন্দ্র ও নেহরু সহ, গান্ধিজির নেতৃত্ব সম্পর্কে সংশয়ী ও কখনও প্রত্যক্ষ বিরোধী হ'লেও, কার্যত গান্ধীকে ছাড়তে চাননি। আর সংখ্যায় কম হলেও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের গোষ্ঠী ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কমিনটার্ন থেকে বহিষ্কৃত এবং কংগ্রেসকে র‍্যাডিকাল চরিত্র দেওয়ার জন্য মতাদর্শ গঠনে সচেষ্ট ছিলেন। সমগ্র তিরিশের দশকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে টানাপোড়েন চলে এবং এক অদ্ভুত জটিলতা তৈরি হয়। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনকালে সুভাষের সভাপতিতে এক পাল্টা আপসবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তিনি হিন্দু-মুসলমানদের নিয়ে গঠিত এক অস্থায়ী সরক র গঠনের জন্য আন্দেলনের আহ্বান জানান। এক সশস্ত্র বিপ্লব গঠনের প্রস্তুতি বলা চলে একে। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিকে ঘিরে আন্দোলনের সূত্রে সুভাষচন্দ্র আবার কারারুদ্ধ হন। এই কারাবাসকালেই তিনি অনুভব করেন যে, আইন অমান্য ও সন্ত্রাসবাদ গঠনই যথেষ্ট নয়, চাই বন্ধু বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সক্রিয় সমর্থন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গেছে, যুদ্ধে ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তিগুলির সাহায্য ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগঠিত করা যায় কিনা, তার চিন্তা তখন প্রবল সুভাষের মধ্যে। এই সময়েই ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি নিজের গৃহে অন্তরীণাবস্থায় সরকারি দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি কাবুল হয়ে বার্লিন চলে যান। বিদেশ থেকে সুভাষ স্বয়ং তাঁর অন্তর্ধানের কথা ঘোষণা করেন ১৯৪১-এর নভেম্বর মাসে। তিনি বলেন যে, শত্রুর শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাতে হবে; তৈরি করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যদল। ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে তৈরি রাসবিহারী বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হন সুভাষচন্দ্র। ১৯৪৩-এর

২১ অক্টোবর তিনি সিঙ্গপুরে প্রতিষ্ঠা করেন আজাদ হিন্দ সরকার। এর পরবর্তী ছয়মাস আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতির ও সাফল্যের সময়। আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্রিটিশরাজ থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য ব্রহ্মদেশের সীমা অতিক্রম করে কোহিমা ও ইম্ফল পর্যন্ত অগ্রসর হয়, কিন্তু মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠার কারণে সুভাষকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। এর পরেই ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইপে-তে এক বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষের মৃত্যু ঘটেছে বলে সংবাদ প্রচার করা হয়। তবে একনও পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু বিষয়ে এক প্রবল বিতর্ক রয়েছে।

৪৭.৩ জাতীয়তাবাদ ও সুভাষচন্দ্র

ইওরোপে জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয়েছিল রেনেসাঁস আন্দোলনের কাল থেকেই। পরে ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতার যুগকে বলা যেতে পারে জাতীয়তাবাদ বিকাশের গুরুত্বময় কাল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপেও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা জোরদার মতাদর্শ ছিল জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের দু'টি ধবন ছিল — নিজের দেশের রাজনৈতিক ঐক্য, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য জাতীয়তাবাদের এক সদর্থক প্রকাশ বিভিন্ন জাতিকে উদ্‌বোধিত করে তুলেছিল। ম্যাটসিনির ভাষায় তা' ছিল 'Nation is mission'। কিন্তু অপর আরেকটি দিকও তার ছিল। এ ছিল উগ্র জাতায়তাবাদের মদমত্ত আস্ফালন। পশ্চিমের ক্ষমতাশালী জাতীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রতাপ প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে তুলেছিল সাম্রাজ্যবাদ। সমাজবিজ্ঞানীরা তাই বলেছেন, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ হ'ল সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর। এই আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে তৈরি হয়েছিল এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশ। আর ওই ঔপনিবেশিকতা তৈরি করেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদ। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ ছিল এই জাতের।

পৃথিবীর সব দেশেই জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার নিজস্ব ইহিতাস আছে। সে-দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ধর্মচেতনা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণ অনুযায়ী একেক দেশের জাতীয়তাবাদ একেক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতবর্ষে যেমন জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয়েছিল ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কারের সূত্রগুলি ধরে। এসবের ভিত্তি ছিল অবশ্যই ব্রিটিশ বণিকদের সৃষ্ট নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু খেয়ালে রাখতে হবে যে, উনিশ শতকের শুরু থেকে এদেশে জাতিগঠনের যে-প্রয়াস তৈরি হয়েছিল তা রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে। উনিশ শতকের শেষে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জাতীযতাবাদের যে-রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাতে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ঐতিহ্যের অতীত গরিমার এক বিশেষ স্থান ছিল। ঐতিহাসিকেরা ওই পর্বের নাম তাই দিয়েছেন হিন্দু পুনরুত্থানবাদের যুগ। জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুত্ব অনেক

ক্ষেত্রে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ নামক দেশটি তো আর হিন্দুর একার নয়। তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সত্য, কিন্তু মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টানরাও এই দেশের জনসমষ্টির এক বৃহদংশ। ফলে, হিন্দু জাতীয়তাবাদ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদে পৌঁছুতে না পারলে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতাপ্রাপ্তি সম্ভব নয় — এই ধারণা গড়ে উঠেছিল অচিরেই। সুভাষচন্দ্র-নেহরু প্রমুখ জাতীয় নেতৃবর্গের জাতীয়তাবাদ এই শেষোক্ত গোত্রের।

সুভাষচন্দ্রের মানসিকতায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিবেকানন্দের বাণী তাঁকে সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কলেজ জীবনে যদিও তিনি বেদান্ত-বিরোধী বস্তু তান্ত্রিক দর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু সুভাষের সারা জীবনের চেতনায় বিবেকানন্দের প্রভাব খুব প্রখর ছিল। অন্যদিকে ইওরোপের সদর্থক জাতীয়তাবাদী দর্শন, বিশেষত ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির আদর্শ, সুভাষকে অনুপ্রাণিত করেছে। আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ছিল প্রবল। যদিও তাঁর স্বাধীনতা-যুদ্ধে কৌশলগত পন্থা হিসেবে জার্মানি-ইটালি-জাপানের (আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত রূপ যাদের মধ্যে দেখা গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্বে) সাহচর্যের কথা আমরা সকলেই জানি। তিনি ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে মিলনের কথাও বলেছেন কখনও কখনও। তথাপি সামগ্রিক বিচারে সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদকে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের কোঠায় ফেলা যাবে না।

জওহরলাল নেহরুর মতো সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি ছিল সমতার আদর্শ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দ্রুত শিল্পায়ন। সমাজতন্ত্র ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভব নয় — এই চিন্তাও তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনায় পরিব্যাপ্ত ছিল। জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে — একথাও খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৩১ সালের ৪ জুলাই তারিখে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, একমাত্র সমাজতন্ত্রই ভারতের এবং পৃথিবীর জনগণকে মুক্তি দিতে পারে। ভারতকে অন্যান্য জাতির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সেই প্রণালীটিকে নিশ্চিতই হ'তে হবে ভারতের প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যে কোনও তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হ'লে ভূগোল এবং ইতিহাসকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। যদি তা কেউ করে সে ব্যর্থ হবেই।' এই জাতীয়তাকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্রের চেতনা আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির বক্তৃতায় — 'কংগ্রেসের লক্ষ্য হ'ল স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ, যে-ভারতবর্ষে কোনও শ্রেণী বা গোষ্ঠী বা সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজের স্বার্থে অপরকে শোষণ করবে না এবং যেখানে ভারতীয় জনগণের সামগ্রিক মঙ্গল ও অগ্রগতির জন্য জাতির সকলে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করবে। সর্বজনীন স্বাধীনতার ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার এই লক্ষ্য কোনও মতেই ভারতীয় জীবনচর্চার বহুল বৈচিত্র ও সাংস্কৃতিক

রূপভেদের অবদমন বোঝাবে না। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তথা প্রতিটি গোষ্ঠী তার সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী অবাধে বিকাশ লাভের সুযোগ ও স্বাধীনতা পেতে পারে তার জন্য ঐ বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক রূপভেদকে রক্ষা করতেই হবে।'

জাতীয় ঐক্যচিন্তা ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য—এই দুই বিষয়েই সুভাষের মনোযোগ ছিল সমানভাবে প্রখর। 'মূল জাতীয় স্রোত' - এর অস্পষ্ট ধারণা অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতো সুভাষকে আচ্ছন্ন করেনি। আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনকে তিনি খুব গুরুত্ব সহকারে ভেবেছিলেন। অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতবর্ষে এই আঞ্চলিকতার গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে প্রতি পদে অনুভূত হচ্ছে।

সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ বিষয়ে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক প্রশান্তকুমার ঘোষ। এই প্রবন্ধের উপসংহারে অধ্যাপক ঘোষ সুভাষের জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূত্রকারে চিহ্নিত করেছেন। সেটি আমাদের প্রণিধানযোগ্য :

'জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ধারণার মূল উপাদানগুলির সংক্ষিপ্তসার এভাবে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, সুভাষচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী (militant) জাতীয়তাবাদের সমর্থক, কিন্তু উগ্র, সংকীর্ণ, আগ্রাসী বা হিন্দু জাতীয়তাবাদের তিনি বিরোধী। দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদী কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশের দরিদ্র, অবহেলিত, শ্রমজীবী মানুষের জন্য বঞ্চনামুক্ত সমাজ গড়ার প্রয়াস। তৃতীয়ত সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন কোনও দেশের সমাজ বা অর্থব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণে সম্ভব হবে না; ভারতের বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করেই এই পরিবর্তন আনা সম্ভব। চতুর্থত, ভারতের জাতীয় ঐক্যের বনিয়াদ হবে এদেশের বহুধাবিভক্ত সংস্কৃতির যথার্থ ও কার্যকর স্বীকৃতি। এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, স্বাধীনতার পরে (বিশেষত ১৯৫০-এর সংবিধান প্রবর্তনের পরে) কেন্দ্রিকতার যে প্রবণতা জাতীয় সংহতির মুখ্য অবলম্বন বলে প্রচারিত হয়ে এসেছে, ভারতীয় ঐক্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল তার বিপরীত। পঞ্চমত, স্বাধীন ভারতে জাতীয় ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য সুভাষচন্দ্র যে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার কথা বলেছেন তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন যেমন স্বীকৃত, তেমনই সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা ও লিপি ব্যবহার এবং জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও প্রবলভাবে সমর্থিত। এ-বিষয়ে তাঁর দূরদর্শিতা সমসাময়িক অন্য অনেক নেতার তুলনায় তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ষষ্ঠত, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে বাস্তবসম্মত উপায়ে যোগসূত্র রচনার কথা তাঁর তত্ত্বে স্বীকৃত। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতির যে আভাস দেন তাতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতিগুলির মধ্যে সহযোগিতার আহ্বান ছিল।'

৪৭.৪ সমাজতন্ত্র ও সুভাষচন্দ্র

জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে বামপন্থী সমাজবাদী ধারা গড়ে উঠেছিল সুভাষচন্দ্র ছিলেন তার এক অন্যতম কান্ডারী। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের ভিতরেই এক উপদল তৈরি হয়েছিল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি নামে। জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব প্রমুখ সমাজতন্ত্রীরা ছিলেন তার কর্ণধার। এঁদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে বহুলাংশে একমত হ'লেও সুভাষ কিংবা নেহরু ওই সমাজতন্ত্রী দলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেননি; কিন্তু চিন্তাভাবনার দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে সুভাষের বিরোধ তেমন কিছু ছিল না। বরং ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে দলের সভাপতি নির্বাচনের সময় দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এই সমাজবাদী বামপন্থী গোষ্ঠীগুলিই সুভাষচন্দ্রকে জয়ী করেছিল। এর অব্যবহিত পরেই সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ফরোয়ার্ড ব্লক নামক উপদলটি তৈরি করেন তখন তার কর্মসূচীতেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বিশেষ স্থান লাভ করে।

সুভাষচন্দ্র মূলত জাতীয়তাবাদী। কিন্তু উদারনৈতিক পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের মতো অনুন্নত দেশের প্রগতি সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজবাদী ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কার সম্ভব নয়। এই কারণে পূর্ণ কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের তৈরি করতে হবে। পশ্চিমী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ধাঁচে সরকার আমাদের কাম্য নয়, বরং সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মতো দলীয় এক নায়কত্বে জবরদস্ত রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ভারতের পক্ষে প্রয়োজন তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য। সোবিয়েতের পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণাটিও সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ওই কমিটি গঠনের চিন্তার ক্ষেত্রে এবং তার কর্মসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রুশবিপ্লব ও সোবিয়েত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্মের সরাসরি প্রভাব ছিল বলে মনে করা হয়। কমিটি গঠনের প্রস্তাব করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'পুনর্গঠনের কথা বলতে গেলে আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে কী করে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা যাবে। সেজন্য চাই জমিদারি প্রথা সমেত আমাদের ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার। কৃষকদের ঋণমুক্ত করতে হবে এবং গ্রামবাসীদের সহজে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর উভয়ের উপকারের জন্য সমবায় আন্দোলনের প্রসার প্রয়োজন। ভূমি হ'তে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।'

ভূমিব্যবস্থার সংস্কারের পাশাপাশি দ্রুত শিল্পায়নের পথে ভারতকে অগ্রসর হ'তে হবে সমাজবাদী পথে, একথাও সুভাষচন্দ্র ওই সময়ে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

তাঁর বক্তব্য ছিল 'অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য কৃষির উন্নতিই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে শিল্পোন্নয়নের এক ব্যাপক প্রকল্প অপরিহার্য হবে। যে পুরাতন শিল্প-ব্যবস্থা বিদেশে ব্যাপক উৎপাদন ও স্বদেশে বৈদেশিক শাসনের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তৎস্থলে একটি নতুন শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনকে যত্নসহকারে বিবেচনা করে স্থির করতে হবে কুটির শিল্পগুলির মধ্যে কোনগুলি আধুনিক কলকারখানার প্রতিযোগিতা সত্বেও পুনরুজ্জীবিত করা উচিত হবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।' উল্লেখ্য বিষয় এখানে এই যে, দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়নের পরিকল্পনায় সুভাষচন্দ্র দেশীয় কুটির শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবনের কথাও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন। এই সূত্রে তিনি গান্ধীর খাদি-শিল্প পরিবর্ধনের কথাও বলেছেন। যদিও গান্ধীর শিল্পায়ন বিরোধী অর্থনৈতিক চিন্তাকে তিনি মানেন নি।

আমূল ভূমিসংস্কার ও ব্যাপক শিল্পায়নের জন্য চাই জবরদস্ত রাষ্ট্রকর্তৃত্ব — এরকম এক সমাজবাদী চিন্তা লালন করেছেন বরাবর সুভাষচন্দ্র। এই ধরনের চিন্তার সূত্রেই তাঁর 'The Indian Struggle' গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে সমন্বয় করেই ভারতের জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের ভিত্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সুভাষ উক্ত গ্রন্থটি লিখেছিলেন ১৯৩৪ সালে। এর চারবছর বাদে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট দলের নেতা রজনীপাম দত্তের এক প্রশ্নের উত্তরে সুভাষ বলেছিলেন, 'তিন বছর আগে ওই বই লেখার পর থেকে আমার রাজনৈতিক ধারণা আরও পরিণতি লাভ করেছে। আমি সত্যি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে, ভারতবর্ষে আমরা চাই জাতীয় স্বাধীনতা, এবং তা, লাভ করার পর সমাজতন্ত্রের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে সমন্বয়ের উল্লেখ করে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলাম। সম্ভবত যে ভাষায় আমি তা প্রকাশ করেছি তা তেমন সন্তোষজনক হয় নি। তবে আমার দিক থেকে একথাও বলে রাখা উচিত যে, যখন আমি বইটি লিখেছিলাম তখনও ফ্যাসিবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান শুরু করেনি এবং আমার কাছে তা মনে হয়েছিল জাতীয়তাবাদের একটা উগ্র সংস্করণ।' (প্রশান্তকুমার ঘোষের প্রবন্ধ থেকে উদ্বৃত)।

কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে — একথার মধ্যেই নিহিত আছে এই সত্য যে, এই দুই মতাদর্শের কোনওটিকেই সুভাষ পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। ফ্যাসিবাদ থেকে যেদু'টি উপাদান সুভাষচন্দ্রের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল, তা' হ'ল জাতীয়তাবাদ (তার উগ্ররূপ নয় কখনই) এবং রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্বে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের চিন্তা। সুভাষচন্দ্রের সমাজবাদকে তাই জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র বলেও আখ্যায়িত কারায়। কমিউনিজম বা সাম্যবাদ যে তাঁর কাছে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ছিল না, তা' বহক্ষেত্রেই তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মার্ক্সবাদী সাম্যবাদ বিরোধিতার কারণগুলি হ'ল এরকম—

(ক) কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে ভারতীয় সংগ্রাম মূলত একটি জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম।

(খ) কমিউনিস্টরা ধর্মে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক। রাশিয়ায় প্রাক্‌বিপ্লবকালে জারের স্বেচ্ছাচারকে চার্চ সমর্থন করত বলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে চার্চ ও ধর্মের বিরোধিতা। ভারতে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক না থাকায় মানুষের সঙ্গে ধর্মের কোনও সংঘাত নেই।

(গ) কমিউনিস্টরা ইতিহাসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদে (economic determinism) অতি বেশি বিশ্বাসী। কমিউনিস্টদের অর্থনৈতিক তত্ত্বের কিছুটা গুণগ্রাহী হলেও ভারত ইতিহাসকে কেবলমাত্র অর্থনীতির দিক থেকে দেখে না।

(ঘ) কমিউনিস্টরা শ্রেণীসংঘর্ষ ও শ্রমিকদের উপর সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়। ভারত শ্রেণীসংঘর্ষ চায় না এবং কৃষিপ্রধান দেশ বলে এখানকার চাষীদের স্বার্থ শ্রমিকদের সমতুল্য। মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে এসব আপত্তির কথা লিখেছেন সুভাষচন্দ্র তাঁর 'The Indian Struggle' -এ । তবে একই সঙ্গে একথাও লিখেছেন যে, মার্ক্সবাদ মানবসভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ অবদান।

৪৭.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নবলী :

১. সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবন ও তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করুন।

২. সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

৩. সুভাষচন্দ্রের সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নবলী :

১। সুভাষচন্দ্রের 'সাম্যবাদ' বলতে কী বোঝেন ?

২। ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের মত কী ছিল?

৩। জার্মাণীর সহযোগিতা গ্রহণের স্বপক্ষে সুভাষচন্দ্রের কী যুক্তি ছিল?

৪। সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীর মধ্যে মতবিরোধের কারণ কী ?

বিষয়মুখী প্রশ্নবলী :

১। সুভাষচন্দ্র কী কারণে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন ?

২। কেন সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. পদ গ্রহণ করেন নি ?

৩। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতিপদে সুভাষচন্দ্র কাকে পরাজিত করেন ?

৪। সুভাষচন্দ্রের লিখিত দু'টি বইএর নাম করুন।

৪৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. V. Grover (ed) Political Thinkers of Modern India, Volume on S.C. Bose,

২. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, দ্বিতীয় খন্ড

৩. জাতীয়তাবাদ ও বাঙালী চিন্তাবিদ, সম্পাদনা সত্যব্রত রায়চৌধুরী, আশসকুমার বসু গ্রন্থভূক্ত প্রশান্তকুমার ঘোষের প্রবন্ধ 'সুভাষচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ'।

একক ৪৮ □ রামমনোহর লোহিয়া

গঠন

৪৮.০ উদ্দেশ্য

৪৮.১ প্রস্তাবনা

৪৮.২ সংক্ষিপ্ত জীবণী

৪৮.৩ লোহিয়ার ইতিহাস চেতনা

৪৮.৩.১ লোহিয়ার দৃষ্টিতে শ্রেণী ও বর্ণ

৪৮.৩.২ ধনতন্ত্র সম্পর্কে লোহিয়া

৪৮.৩.৩ ধনন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ : একই সভ্যতার দু'টি রূপ

৪৮.৩.৪ সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা

৪৮.৩.৫ নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার বৈশিষ্টসমূহ

৪৮.৩.৬ সভ্যতার বাস্তব রূপায়নে পন্থা ও পদ্ধতি

৪৮.৪ চিন্তানায়ক লোহিয়া

৪৮.৫ সারাংশ

৪৮.৬ অনুশীলণী

৪৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪৮.০ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় সমাজবাদী চিন্তানায়ক ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার মৌলিক চিন্তা-ভাবনার সাথে পরিচিত হব। এই অংশে আমরা তাঁর চিন্তাধারার যেসব দিকগুলির আলোচনা করব সেগুলি হল —

- লোহিয়ার ইতিহাস দর্শন
- শ্রেণী ও বর্ণ সম্পর্কে লোহিয়া
- ধনতন্ত্রে বিকাশ সম্পর্কে লোহিয়ার ধারণা
- সমাজতন্ত্রিক সভ্যতার প্রকৃতি

৪৮.১ প্রস্তাবনা

স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক পটভূমিকায় ভারতবর্ষে সমাজবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (সি. এস. পি) গঠনের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন প্রথম সংহত রূপ লাভ করে। প্রথমদিকে যে সব সমাজবাদী চিন্তনায়কদের অবদান ভারতীয় সমাজবাদী চিন্তাধারাকে পুষ্টিদান করেছিল তাদের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, অচ্যুত পট্টবর্ধন, মিনু মাসানী, অশোক মেহতা ও ডা. রামমনোহর লোহিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। পার্টির মধ্যে নতুন চিন্তার উন্মেষ হওয়ায় এই সব নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পথ ধরে চলতে আরম্ভ করলেন। জয়প্রকাশ গেলেন সর্বোদয়ের পথে, মাসানী ধরলেন উদারনীতির পথ, অশোক মেহতা কংগ্রেসী গণতন্ত্রে আকৃষ্ট হ'লেন, পট্টবর্ধন বেছে নিলেন অধ্যাত্মবাদের পথ, নরেন্দ্র দেব শেষ পর্য্যন্ত আত্মনিয়োগ করলেন মার্ক্সবাদে। আর যিনি অন্য কোনও পথে না গিয়ে সোশ্যালিজম্‌কেই (Socialism) ইতিহাসসম্মত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করলেন তাঁর নাম হ'ল ডা. রামনোহর লোহিয়া।

৪৮.২ সংক্ষিপ্ত জীবনী

স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতা হীরালাল লোহিয়ার একমাত্র পুত্র রামমনোহর লোহিয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে মার্চ উত্তরপ্রদেশের আকবরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে মাতৃহারা রামমনোহর তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভিন্ন এলাকায় সম্পন্ন করেন। পিতার সঙ্গে ১৯২১ সালে জাতীয় কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদান করেন ও প্রথম গান্ধীজীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। ১৯২৯ সালে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। পরে সেখান থেকে জার্মানী চলে যান। ১৯৩২ সালে হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পি. এইচ. ডি উপাধি লাভ করে ১৯৩৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেস শ্যোসালিস্ট পার্টি গঠনকারীদের অন্যতম ছিলেন রামমনোহর লোহিয়া। সেই সঙ্গে দায়িত্ব নেন 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনার। ২৬ বছর বয়সে নেহেরুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কংগ্রেসের বিদেশ নীতি বিভাগের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রচনা করেন প্রথম পুস্তিকা 'The Struggle for Civil liberties'। জাতীয় কংগ্রেসের যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহী হিসাবে লোহিয়া এক বছর কারাদন্ড ভোগ করেন।

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে আত্মগোপনকারী নেতাদের মধ্যে অন্যতম রামমনোহর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং গুপ্তজীবনে বোম্বাই এবং কলকাতা থেকে স্বাধীন বেতার

কেন্দ্র পরিচালনা করেন। ১৯৪৪ সালে গ্রেপ্তারের পর ব্রিটীশ সরকার লাহোর দুর্গে লোহিয়ার উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্পেষণ করে।

১৯৪৬ সালে কারামুক্তির পরই গোয়ার মুক্তি আন্দোলনে প্রথম সত্যাগ্রহী হিসাবে লেহিয়াজী ১৯৪৭ সালে কারাবরণ করেন এবং গোয়া থেকে নিস্কাসিত হন।

১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর হত্যার পরই জয়প্রকাশ, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, অশোক মেহতা সহ লোহিয়াজী কংগ্রেস ত্যাগ করে পুরোদস্তর সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন।

১৯৫২ সালে নেপালের রাজার রাণাশাহীর বিরুদ্ধে নেপালী কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে লোহিয়া সক্রিয় সমর্থন জানান। ঐ বছরই সোস্যালিস্ট পার্টির পাঁচমারী সম্মেলনে লোহিয়া কমিউনিজম্ ও ক্যাপিটালিজমের থেকে সমাজবাদী দর্শনের মৌলিক পার্থক্যের বুনিয়াদ রচনা করেন।

১৯৫৪ সালে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে থানু পিল্লাইয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে প্রজা সোস্যালিস্ট সরকার নিরস্ত্র কৃষক আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালালে লোহিয়াজী এর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সরকারকে পদত্যাগ করতে আহ্বান জনান, যদিও তাঁর সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। ১৯৫৫ সালে হায়দরাবাদে তিনি নতুন করে সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন।

১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের প্রতিবাদ করেন। উত্তর প্রদেশের ফরাক্কাবাদ জেলার উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে ১৯৬০ সালে লেহিয়া প্রথম লোকসভায় প্রবেশ করেন। ১৫ বছর কংগ্রেস শাসনে সর্বপ্রথম নেহেরু সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সোস্যালিস্ট ও প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির মিলনে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি গঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। বস্তুত ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত দেশের সর্বত্র লোহিয়াজীর 'কংগ্রেস হঠাও, দেশ বাঁচাও' আন্দোলনের পরিণাম হিসাবে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মাত্র ৮টি রাজ্যে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আজীবন সংগ্রামী, আপোষহীন এই নেতার জীবনদীপ নির্বাপিত হয় ১৯৬৭ সালের ১২ই অক্টোবর।

৪৮.৩ লোহিয়ার ইতিহাস চেতনা

লোহিয়ার কাছে ইতিহাস শুধু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বর্ণনা মাত্র নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন ইতিহাসের একটা নিজস্ব গতি বা pattern আছে। মার্ক্সের মতে, মানব সভ্যতার ইতিহাস ক্রমাগত উন্নতির ইতিহাস। এই ক্রমবিকাশের পথে প্রথমে আসে আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা, তারপরে আসে দাস ব্যবস্থা, তারপরে সামন্ততন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের পরে আসে পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদের চরম বিকাশ ঘটার পর পৃথিবীতে আসবে সমাজতন্ত্র; অবশেষে সমাজতন্ত্রবাদের সর্বোচ্চ স্তরে আর্বিভাব ঘটবে উন্নত ধরনের সাম্যবাদ। এই ধরনের মতবাদকে linear view of hintorical progress বলা হয়।

কিন্তু লোহিয়া এই ধরনের ব্যাখ্যার সমালোচনা করে বলেন, বিশ্বের সমস্ত যুগের সমস্ত অঞ্চলের ইতিহাসকে এইভাবে তিন চারটি নির্দিষ্ট ধাপে বিভক্ত করা যায় কিনা সন্দেহ। ইতিহাসের জটিল গতির এ যেন এক অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। ইতিহাসকে যেন জোর করে একটি ছকে টেনে আনার প্রচেষ্টা।

গভীর অনুসন্ধামী বিশ্লেষণের মাধ্যমে লোহিয়া উপলব্ধি করেছেন যে এ যাবৎ বিশ্বে কেবল একটি মাত্র মানব সভ্যতাই বিকশিত হয়ে চলেছে তা নয়। বিগত দুই শতাব্দী ধরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য্যের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনেক প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে, যেমন - মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা ইত্যাদি। এই সকল সভ্যতার উদয় যেমন হয়েছে, ধীরে ধীরে তাদের অবলুপ্তিও হয়েছে। সভ্যতার উত্থান পতনকে মেনে নিয়েই লোহিয়া তাঁর ইতিহাস দর্শনের মূলসূত্রগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

লোহিয়ার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, প্রত্যেক সভ্যতা প্রথম দিকে উন্নতির পথে এগিয়ে যায়, তারপর সাময়িক স্থিতাবস্থা এলেও পরবর্তী সময়ে তা অনিবার্যভাবে পতনের দিক ধাবিত হয়েছে — ইতিহাস চক্র এই নিয়মেই আবর্তিত হয়ে চলেছে। কোনও সভ্যতা যখন উন্নতি বা সমৃদ্ধির পথে বিকশিত হ'তে থাকে তখন সেই সমৃদ্ধির লভ্যাংশ ভাগ করে নেওয়ার জন্য সমাজের আন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে সক্রিয় প্রচেষ্টা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে লোহিয়া তাকেই শ্রেণী সংগ্রাম আখ্যা দিয়েছেন।

সভ্যতাগুলির পতনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লোহিয়া দেখেছেন যে, প্রতিটি সভ্যতার অন্তর্নিহিত ত্রুটিই এর জন্য দায়ী। আজ পর্যন্ত বিশ্বে যতগুলি সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছে তাদের মধ্যে কোনও সভ্যতাই মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা না করে তার কোনও না কোনও বিশেষ দিকের প্রতি জোর দিয়েছে; তা ছাড়া সমগ্র মানবসমাজকে কেন্দ্র করেও কোনও সভ্যতা গড়ে ওঠে নি। লোহিয়ার ভাষায় total efficiency -র পরিবর্তে partial efficiency কে সন্ধান করায় প্রতিটি সভ্যতাই একটি বিশেষ দিকে maximum efficiency অর্জনের চেষ্টা করেছে এবং অন্যদিকগুলিকে উপেক্ষা করেছে। এইভাবে একপেশে উন্নতির জন্য সমাজ তার আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য হারিয়ে Dinosours -এর মত নিজের শরীরের চাপে নিজেরই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়; তার পতন হয়ে পড়ে অনিবার্য। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতাও তার থাকে না।

৪৮.৩.১ লোহিয়ার দৃষ্টিতে শ্রেণী (class) ও বর্ণ (caste)

কোনও সভ্যতা যখন উন্নতি বা সমৃদ্ধির পথে বিকশিত হ'তে থাকে তখন সেই সমৃদ্ধির লভ্যাংশ ভাগ করে নেওয়ার জন্য সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে সক্রিয় প্রচেষ্টা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে লোহিয়া তাকেই শ্রেণীসংগ্রাম আখ্যা দিয়েছেন। এর ফলে গোষ্ঠীগুলির অবস্থান নির্দিষ্ট থাকে না, তাদের উন্নতি বা অবনতি ঘটে। এই সচলতা বা গতিশীলতাই হ'ল শ্রেণী বা গোষ্ঠীগুলির বিশেষত্ব।

কিন্তু এই উন্নতির চরমসীমায় পৌঁছানোর পর যখন আর অগ্রসর হ'তে পারে না তখন শুরু হয় পতনের অধ্যায়। তবে, সাময়িকভাবে এই পতন রোধ করবার চেষ্টা করা হয় শ্রেণীকে (Class) বর্ণে (Caste) পরিণত করার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। Justice বা ন্যায়নীতির নামে একটি সামাজিক কাঠামোতে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলিকে বেঁধে তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তখন, লোহিয়ার ভাষায় পরিণত হয় Caste-এ। Class -এর সচলতা তখন আর আমরা Caste - এ পাই না। বস্তুত লোহিয়ার মতে, কোনও সভ্যতার পতন যখন শুরু হয় তখন শ্রেণী সংগ্রাম বন্ধ হয়ে যায় ও বর্ণাবস্থা শুরু হয়। আর এই বর্ণাবস্থার সাহায্যে সভ্যতা সাময়িকভাবে অচলাবস্থার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখলেও, শেষ পর্য্যন্ত অনিবার্যভাবে পতনের পথে ধাবিত হয়। তাঁর ভাষায়, "Internally all human history has been an internal movement between castes and classes, between classes solidifying into castes and castes rousing into classes." (Wheel of History - P. 38) অর্থাৎ, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সমাজ বিবর্তন এইভাবে শ্রেণী থেকে বর্ণ আবার বর্ণ থেকে শ্রেণীতে রূপন্তরের ইতিহাস। তাই শ্রেণী সংগ্রামের বাস্তবতাকে অস্বীকার না করলেও মার্ক্সের মতো তিনি বিশ্বাস করেন না যে, কেবল শ্রেণীসংগ্রামের পথেই সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে।

ভিতরের এই সংঘাত ছাড়াও লোহিয়া বাইরের জগতের সাথে এক ধরনের সংগ্রামের কথা বলেছেন। সেটি হ'ল জাতিতে জাতিতে, অঞ্চলে অঞ্চলে সংগ্রাম যার ফলে সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়। লোহিয়া একে Continental shift নামে অভিহিত করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যে অঞ্চলে একবার সভ্যতার উদ্ভব ও পতন ঘটেছে পরবর্তীকালে সেই অঞ্চলেই আবার নতুন সভ্যতার আর্বিভাব ঘটবে তা নয়। একটি বিশেষ ধরনের সভ্যতার পতনের পর সেই অঞ্চলেই অন্য এক দিকের উপর জোর দিয়ে আর এক বিশেষ ধরনের সভ্যতার আবির্ভাব ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম।

৪৮.৩.২ ধনতন্ত্র সম্পর্কে লোহিয়া

লোহিয়ার মতে, মার্ক্স ধনতন্ত্রকে কেবল পশ্চিম ইউরোপীয় ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। এ কথা সত্য যে ধনতন্ত্র প্রথমে পশ্চিম ইউরোপেই বিকশিত হয় ও পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু এর ব্যাখ্যা হিসাবে মার্ক্স কেবল সমাজের অর্ন্তনিহিত কারণকেই দায়ী করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের কারণে পুঁজিবাদী দেশে দু'টি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে — একদিকে বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী অল্প সংখ্যক পুঁজিপতি শ্রেণী এবং অন্যদিকে থাকে সমস্তরকম বিষয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত, দরিদ্র, নিষ্পেষিত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী। উদ্বৃত্ত মূল্যের মাধ্যমে পুঁজিবাদী শোষণের ফলে একদিকে যেমন সম্পদের কেন্দ্রিভবন ঘটবে তেমনি আবার সেখানে দেখা যাবে শ্রমের সামাজিকীকরণ ও শ্রমিকদের দৈন্যদশার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করলে

একদিন বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি রচনা করবে।

কিন্তু লোহিয়া লক্ষ্য করেছেন যে, ইংল্যান্ড বা জার্মানীর মতো পুঁজিবাদী দেশে দু'টি শ্রেণীর মধ্যে বৈষয়িক তারতম্য যথেষ্ঠ থাকলেও সাধারণভাবে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতির দিকেই যায়। বরং দারিদ্র্য ও দুর্দশা বেড়ে চলে ভারতবর্ষের মতো উপনিবেশগুলিতে। মার্ক্সের মতে, পুঁজিবাদী দেশের অভ্যন্তরে মালিক শ্রেণীর সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য ও শোষণ বেড়ে চললেই সৃষ্টি হবে বিপ্লবের পরিস্থিতি। কিন্তু কার্যত লোহিয়া দেখলেন যে, পুঁজিবাদী দেশের শ্রেণী-সম্পর্ক সেইভাবে যাচ্ছে না।

মার্ক্সবাদীদের মতে, 'উদ্বৃত্ত মূল্য' বা ব্যক্তিগত মুনাফাই হ'ল শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের একমাত্র কারণ। অন্যদিকে লোহিয়ার ধারণা হ'ল আভ্যন্তরীণ কারণের সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিকাশের একটি বাহ্যিক কারণও উপস্থিত। পাশ্চাত্যের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বর্তমান অস্বাভাবিক অগ্রগতি ও ধনসম্পদের মূলে সেই সমাজের আভ্যন্তরীণ রসদ ও দ্বন্দ্বই দায়ী নয়, সেই সঙ্গে আছে তাদের উপনিবেশিক শোষণ এবং উপনিবেশগুলি থেকে সংগৃহীত বিপুল ধনরাশি ছাড়া ধনতন্ত্রের বিকাশই ছিল একপ্রকার অসম্ভব। লোহিয়ার মতে, এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ছাড়া বিশ্বে বর্তমান ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ করত না। লোহিয়ার ভাষায়, "In order, therefore to understand capitalist development, it will be necessary to think of capitalist economy as consisting not alone of an internal circle represented by the West European economy but of two circles an internal European circle and an external world circle, from which the internal West European circle draws its dynamic, surplus value, its exploitation, its sucking and 'so on'. (Marx, Gandhi and Socialism – P. 96)। বিষয়টি যে মার্ক্সের অজানা ছিল তা নয়, তবে তিনি কখনই এটিকে ধনতন্ত্র বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন নি।

৪৮.৩.৩ ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ : একই সভ্যতার দু'টি রূপ

লোহিয়ার মতে, আধুনিক সভ্যতা ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদের সমন্বয়ে গঠিত। একটি আরেকটির থেকে মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র — এ দাবি লোহিয়ার কাছে অযৌক্তিক। তাঁর মতে, ধনতন্ত্র এবং কমিউনিজমের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তারা একই সভ্যতার দু'টি রূপ মাত্র। তাদের মধ্যে সব থেকে বড় পার্থক্য উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার। ধনতন্ত্রে যেখানে উৎপাদনের উপাদানের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত, অন্যটিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। এই পার্থক্য ছাড়া, লোহিয়ার মতে, তাদের অজস্র সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখি বিজ্ঞান ও উন্নত কারিগরী জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিপুল মূলধন ভিত্তিক জটিল ও বৃহদায়তন কলকারখানা স্থাপন করে অপেক্ষাকৃত কম খরচে ব্যাপক আকারে পণ্য উৎপাদন ও ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি করে যাওয়ার তীব্র প্রচেষ্টা। উভয়েরই ধারণা অর্থনৈতিক সমস্যাই হ'ল প্রধান এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারলে অন্যান্য সমস্যার সমাধানও সম্ভব। লোহিয়া আরও আশ্চর্য্য হয়েছেন এই কারণে যে, ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ উভয় তত্ত্বের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার দাবি থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তাদের কোনটির মধ্যেই নেই বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী। অর্থনৈতিক সমস্যার কথা ভাবলেও তা' কেবল নিজের দেশের নাগরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; সমস্ত পৃথিবীর মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যাথা নেই। বিশেষত, তৃতীয় দুনিয়ার অনুন্নত দুর্বল রাষ্ট্রগুলির সমস্যাকে উপলব্ধি করার ও তাকে দূর করার মনোভাব কাজের মধ্যে নেই। এইভাবে অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের তাগিদে বর্তমান সভ্যতা অস্বীকার করেছে জীবনের অন্যান্য দিকগুলিকে।

বস্তুত, লোহিয়ার মতে, ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ উভয় মতবাদই গড়ে উঠেছে উন্নত পাশ্চাত্য ইউরোপের প্রেক্ষাপটে যেখানে উৎপাদিকা শক্তি উন্নত, বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান উন্নত, রয়েছে ধনসম্পদের বিপুল ভান্ডার আবার সেই তুলনায় জনসংখ্যাও কম। অন্যদিকে, লোহিয়া দেশিয়েছেন, ভারত সহ বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দারিদ্র্যপীড়িত এই অঞ্চলগুলির প্রধান সমস্যা হ'ল তার বিপুল জনসংখ্যা এবং স্বল্প মূলধন। সুতরাং, এখানে ধনতন্ত্রবাদী বা কম্যুনিস্ট দেশে প্রচলিত উৎপাদন যন্ত্র অনুকরণ করে সাফল্যের আশা কম। আবার, সাম্রাজ্যও নেই যা শোষণ করে বাইরে থেকে সম্পদ সংগ্রহ করবে। তার সঙ্গে রয়েছে বিপুল জনসংখ্যার সমস্যা। তাই লোহিয়া তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা সমাধানে Capitalism বা Communism উভয়ের 'equal irrelevance' এর তত্ত্বের অবতারণা করেছেন।

৪৮.৩.৪ সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা

তাই লোহিয়া স্বপ্ন দেখেন এক নতুন সভ্যতার। বিশ্বের সমস্ত মানুষকে নিয়ে মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সংকল্প নিয়ে এই সভ্যতার আবির্ভাব ঘটবে। এ সভ্যতা ধনতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের অংশ বিশেষ হবে না। এই সভ্যতা কেবল শ্রেণী বা বর্ণের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামেরই অবসান ঘটাবে না। সেইসঙ্গে রোধ করবে আঞ্চলিক সভ্যতার প্রবণতাকে। এই নতুন সভ্যতাকেই লোহিয়া নাম দিয়েছেন 'Socialist Civilization বা সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা, যার আবির্ভাব ঘটবে বর্তমান সভ্যতার পীঠস্থান পশ্চিম ইউরোপে নয়, বিশ্বের অনুন্নত অনগ্রসর এই দুই তৃতীয়াংশে। এই সভ্যতাগুলির বৈশিষ্ট্যও হবে নতুন, সৃষ্টি করবে নতুন পরিচালিকা শক্তির।

৪৮.৩.৫ নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই নতুন সভ্যতা ধনতন্ত্র বা সাম্যবাদ কারোর উৎপাদন শক্তি ও প্রযুক্তির উপর নির্ভর না করে সৃষ্টি

করবে তার নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তি। এখানে এমন এক ধরনের প্রযুক্তি প্রয়োজন যা হবে একাধারে স্বল্প মূলধন উপযোগী, যা একই সঙ্গে বহুলোকের কর্মসংস্থানে সক্ষম অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞান সমন্বিত। লোহিয়া এর উত্তর খুঁজে পেলেন Small unit machine technology বা ক্ষুদ্রায়তন যন্ত্র শিল্পের মধ্যে।

শুধু নিজের দেশের জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য higher and higher standard of living এর পরিবর্তে এই সভ্যতা গ্রহণ করবে 'decent standard of living throughout the world' এর আদর্শ যা কেবল অর্থনৈতিক লক্ষ্যই নয় সেইসঙ্গে জীবনের অন্যান্য সাধারণ লক্ষ্য, যেমন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, নৈতিক ন্যায়পরায়ণতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, মানসিক শান্তি অর্জনে প্রয়াসী হবে।

গান্ধীজীর মতো তিনিও ঘৃণা করতেন ক্ষমতার কেন্দ্রিভবনকে। Small unit machine technology-র মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শ গ্রহণ করার সাথে সাথে লোহিয়াও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণকেই (decentralization) আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং সেই আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন 'four pillar state' বা চৌখাম্বা রাষ্ট্রের ধারণায়। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা মূলত চারটি স্তরে বিভক্ত — গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলাস্তরে সরকার, প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার এবং সর্বোচ্চস্তরে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার। এরা প্রত্যেকেই একদিকে যেমন স্বতন্ত্র ক্ষমতাসম্পন্ন হবে তেমনি আবার পরস্পরের উপর নির্ভরশীলও হবে।

বিশ্বব্যাপী এক নতুন মানব সভ্যতা স্থাপনের আদর্শে অনুপ্রাণিত লোহিয়া তাঁর দৃষ্টিকে শুধু নিজের দেশের গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সমগ্র বিশ্বে। আর তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করতে লোহিয়া তাঁর চৌখাম্বা রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে আরেকটি স্তম্ভ যুক্ত করতে চেয়েছেন; সেটি হ'ল বিশ্বরাষ্ট্র বা World State। বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে সহযোগিতার যে রীতি প্রচলিত আছে তা লোহিয়াকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কারণ, এর মধ্যে দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক আছে যা মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি করে। স্বেচ্ছামূলক আন্তর্জাতিক বাহিনী (Voluntary International Brigades) গঠন করে তার মাধ্যমে গঠনমূলক কাজ করার দিকেই লোহিয়ার ঝোঁক ছিল বেশি।

৪৮.৩.৬ সভ্যতার বাস্তব রূপায়ণের পন্থা ও পদ্ধতি

নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার প্রকৃতি বর্ণনা করেই লোহিয়া ক্ষান্ত হন নি। এই সভ্যতা কিভাবে অর্জন করা যাবে তার পদ্ধতি সম্পর্কেও লোহিয়া বিচার বিবেচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, ইতিহাস আপনাথেকেই (automatically) বিশ্বকে এই সভ্যতা প্রদান করবে না। বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রকৃতিকে

সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করে নীতিনিষ্ঠভাবে মানুষকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এই পরিবর্তন আনতে। আবার মার্ক্সের মতো সাম্যবাদী সমাজস্থাপনের দায়িত্ব কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দিতেও নারাজ। লোহিয়ার ইতিহাস চিন্তনে মানুষের সচেতন ইচ্ছাশক্তি ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা স্বীকৃত। সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সমস্ত মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ইতিহাসের উত্থান পতনের চক্রাকারগতির পরিবর্তনসাধন সম্ভব।

সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লোহিয়া শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সাম্যবাদীরা নিরন্তর সংগ্রামের পক্ষপাতী; অন্যদিকে গান্ধীজী জোর দিয়েছেন গঠনমূলক কাজের উপর, আবার গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। লোহিয়া মনে করেন, এই তিনটি নীতি পরস্পর বিরোধী তো নয়ই, বরং পরস্পরের পরিপূরক। তাই তাঁর ঘোষিত আদর্শ হল 'spade, vote and Jail' যেখানে গঠনমূলক কাজের প্রতীক হল spade, পার্লামেন্টরী গনতন্ত্রের প্রতীক হ'ল vote যেখানে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় এবং সর্বশেষে Jail এর অর্থ সত্যাগ্রহ ও কারাবরণ। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি গান্ধীজীর প্রদর্শিত অহিংস সত্যাগ্রহের পথকেই বরণ করে নিয়েছেন। তবে বাস্তব অবস্থার বিচারে প্রয়োজনে সাময়িকভাবে অহিংসনীতি ত্যাগ করতেও পিছুপা ছিলেন না। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব।

এখানে উল্লেখ্য এই যে, ক্ষমতা দখলের উপর জোর দিলেও ছলচাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, দুর্নীতি ও হানাহানির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টাকে তিনি বরাবর নিন্দা করেছেন। উদ্দেশ্যে ও উপায়ের সম্পর্কে সম্বন্ধে লোহিয়া গান্ধীজীর মতামতকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর doctrine of immediacy -তে লোহিয়া জানিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি কাজকে তার তাৎক্ষনিক ফলাফল বা immediate test দ্বারা বিচার করতে হবে। বর্তমান পন্থা-পদ্ধতি সঠিক না হ'লেও শেষ ফলাফল ভাল হবে, অর্থাৎ শুধু remote test দ্বারা সব কাজকে সমর্থন করার পক্ষপাতী লোহিয়া নন। আমরা যা পেতে চাই আর বর্তমানে যা করি এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরী।

৪৮.৪ চিন্তানায়ক লোহিয়া

পশ্চিমী সংস্পর্শে আসার পরই আধুনিক ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করে। যদিও আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন, কিন্তু চিন্তায় ও মতবাদে তাঁরা পশ্চিমী ধারণা সমূহকেই আদর্শ হলে মেনে নিতেন এবং বিশ্বাস করতেন এই পথেই আসবে ভারতের প্রগতি। সমাজবাদও এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজবাদের উদ্ভব ইউরোপে এবং ইউরোপের প্রেক্ষাপটেই তার বিকাশ। পরে তা' ছড়িয়ে পড়ে ভারত সহ বিশ্বের অন্যান্য অংশে। ভারতীয় সমাজবাদী

চিন্তানায়কগণ স্বাভাবিক কারণেই সমাজবাদের ইউরোপীয় মডেলটিকেই — তা' সে সাম্যবাদ বা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ যাই হোক না কেন আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন।

লোহিয়ার কৃতিত্ব এইখানেই যে, তিনি হচ্ছেন সেই বিরল সমাজবাদী যিনি সমাজবাদকে শুধু জীবনে আদর্শ হিসাবে গ্রহণই করেন নি, তাকে ইউরোপীয় শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একটি বিশ্বজনীন রূপদান করেছিলেন। তাঁর চেতনায় শুধু ইউরোপ নয়, ছিল তৃতীয় বিশ্বসহ গোটা দুনিয়া। স্পষ্টবাদী, স্বাধীনচেতা একজন তুখড় ও সক্রিয় রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সল্পজীবনে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন যেগুলি তাঁর সৃজনধর্মী চিন্তাশক্তির স্বাক্ষর বহন করে। তাত্ত্বিক নেতা বলতে যা বোঝায় লোহিয়া তা' কোনওদিনই ছিলেন না। কিন্তু কোনও স্বীকৃত তত্ত্বকে বিনা বিচারে অন্ধভাবে অনুকরণ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্যই ছিল বর্তমান বিশ্বের অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও বিরোধকে খুঁজে বের করে তাকে যুগোপযোগী ও প্রাসঙ্গিক করে পেশ করা। ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্স ও গান্ধী উভয়ের চিন্তাধারাই তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। দু'জনের কাছ থেকেই তিনি গ্রহণ করেছেন প্রচুর, কিন্তু অন্ধভাবে অনুকরণ করেননি কাউকে। এখানেই তাঁর স্বকীয়তা।

৪৮.৫ সারাংশ

সম্ভবত রামমনোহর লোহিয়া হ'লেন একমাত্র ভারতীয় সমাজবাদী চিন্তানায়ক যিনি সোস্যালিস্ট চিন্তাধারাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্যের অনুকরণ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে নিজস্ব পরিচয়ে উদ্ভাসিত করেন। তাঁর চিন্তার স্বকীয়তার পরিচয় মেলে তাঁর ইতিহাস দর্শনে, তাঁর শ্রেণী ও বর্ণের অভিনব ব্যাখায়। তাঁর সব থেকে বড় কৃতির এই যে, তিনি সাম্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ - দু'টি মতবাদকেই একই সভ্যতার দু'টি রূপ বলে বর্ণনা করেছেন। ইউরোপের প্রেক্ষাপটে এদের জন্ম হ'লেও তৃতীয় বিশ্বের সমস্যার সমাধানে এরা কতখানি অপারগ তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। এর জন্য চাই নতুন সভ্যতা, নতুন রাস্তা, নতুন পথ। বিশ্বজনীন এই সভ্যতাই লোহিয়ার সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা।

৪৮.৬ অনুশীলনী

১) ইতিহাসের চক্রাকার গতি বলতে লোহিয়া কি বুঝিয়াছেন? এই চক্রাকার গতির পরিবর্তন কি ভাবে সম্ভব বসে তিনি মনে করেন?

২) শ্রেণী ও বর্ণ সম্বন্ধে লোহিয়ার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৩) লোহিয়া কি কারণে ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদকে একই সভ্যতার দু'টি রূপ বলে বর্ণনা করেছেন?

৪) নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার প্রকৃতি কিরূপ হবে বলে লোহিয়া মনে করেন?

৫) সংক্ষেপে আলোচনা করুন :

ক) 'Small unit-machine technology' সম্পর্কে লোহিয়া

খ) লোহিয়ার doctrine of immediacy

গ) লোহিয়ার শ্লোগান 'Spade, vote and jail'.

৪৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) R. M. Lohia : Marx, Gahdhi and Socialism (Hydrabad, Navhind, 1963).

২) R. M. Lohia : Wheel of History

৩) N. C. Mehrotra : Lohia : A Study

৪) V. K. Arora : Rammanohar Lohia and Socialism in India (New Delhi, Deep and Deep, 1984)

৫) M. Arunugam : Socialist Thought in India : The contribution of Rammonhar Lohia (New Delhi, Sterling, 1978)

৬) C. Chandhuri : Rammanohar Lohia and the Indian Socialist Thought (Calutta Minerva, 1993)